ঈমানের দাবী

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী র.

আল ইরফান পাবলিকেশন্স
১২/ধ, বাসা-৮৯, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সব প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। অসংখ্য দরূদ ও সালাম খাতেমুন নাবিয়্যীন রহমাতুল্লিল আলামীনের প্রতি। তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও পরিজনবর্গের প্রতি আল্লাহর অপার রহমতের অবারিতধারা বর্ষিত হোক।

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এক প্রাতঃস্মরণীয় নাম। খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার উভয়পুত্রের শোণিত ধারা যার ধমনীতে বহমান ছিল, হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী রহ. এর পারিবারিক ঐতিহ্য যিনি ধারণ করতেন, আখেরী যামানায় ক্রুসেড ও ইরতিদাদের সায়লাব যার নজর এড়ায়নি, তাছাড়া আরব অনারব অসংখ্য দেশ সফরের অভিজ্ঞতা যার দৃষ্টিসীমা অনেক প্রসারিত ও গভীর করেছিল, সেই মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. সারাটি জীবন ব্যয় করেছেন মুসলিম উম্মাহর চিন্তানৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার কাজে। তিনি হৃদয়ের গভীর থেকে আহ্বান জানিয়েছেন মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সাধারণ মুসলমানদের ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর প্রতি নজর দিতে।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. মুসলিম উম্মাহর একজন দরদী অভিভাবক হিসেবে পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সাবলীল ও আলঙ্কারিক ভাষায়, অকৃত্রিম ভঙ্গিতে। বক্তৃতায় ও লেখনীতে তিনি একই ধাঁচ ও রুচি অনুসরণ করেছেন। তাই তার প্রতিটি বক্তব্যই হৃদয়গ্রাহী। বিভিন্ন স্থানে, উপলক্ষে ও প্রসঙ্গে দেয়া তাঁর ভাষণগুলোতে বিষয়বস্তু ও ভাবধারণার যে সাযুজ্য পাওয়া যায়, তার আরো একটি নমুনা আমাদের বর্তমান সঙ্কলন। আধুনিক মানস ও প্রবণতার সামনে হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. এর সুচিন্তিত বক্তব্য তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করে আমরা এগুলোর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করছি। দুআ করি ও পাঠকদের কাছে দুআ চাই, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই সামান্য শ্রম কবুল করুন এবং এটাকে আমাদের আখেরাতের নাজাতের উসিলা করুন। আমীন।

তারিখ : ০১. ০২. ২০০৯ ঈ.

মাওলানা লিয়াকত আলী
মাদরাসা দারুর রাশাদ

সূচীপত্র

ঈমানের দাবী

[ঈমানদীপ্ত এ বয়ানটি হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র. পেশ করেছিলেন ২৭/০২/১৯৮৩ ঈ. রাত ৮টায় বস্তী খায়ের ইন্টার কলেজ ময়দানে 'দীনী তালীমী কাউন্সিল' কর্তৃক আয়োজিত এক সাধারণ সমাবেশে।]

بسم الله الرحمن الرحيم

খুৎবায়ে মাসনুনার পর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেন–

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

সম্মানিত সুধী!

রাত অনেক হয়ে গেছে, আর আমার মানসিক অবস্থা এরূপ যে, দুআ করে জলসার ইতি টেনে দিতে মনে চাচ্ছে, কিন্তু তাদের জন্য আমার লজ্জা হচ্ছে যারা এ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে বসে আছেন। তবে তাদের ধৈর্যের অনেক পরীক্ষা নেয়াটাও আমার কাছে সমীচীন মনে হচ্ছে না, কারণ ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। আর তা ছাড়া যেসব কথা মনযোগ এবং আগ্রহের সাথে বলা হয়, সে কথাগুলো শ্রোতাবৃন্দও আগ্রহ করে শুনে থাকেন এবং তার ক্রিয়াও হয়ে থাকে।

সুতরাং আমি দীর্ঘ কোন তকরীর করব না আর আপনারা তো অনেক্ষণ ধরেই তকরীর শুনছেন। আপনাদের এমন কোন অভিযোগও নেই যে, তকরীর শুনতে পাননি। দু'একজন ব্যতীত প্রায় সকলেই পরিপূর্ণ তকরীর করেছেন। এজন্য আমার কাজ অনেকটা বরং বলতে গেলে প্রায় শতকরা ৯৫% বা ৯৮% কাজ আমার পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে গেছে।

একটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন

আমি আপনাদের সামনে কুরআনে কারীমের একটি আয়াত পাঠ করেছি। আয়াতটির সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি আগে আপনাদের শুনিয়ে দেই– এক সময় কিছু

মুসলমান এমন ছিলেন, যারা প্রাণকে হাতের তালুতে রেখে এবং নিজেকে বিপদসংকুল পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত করেও ইসলামের খিদমত অব্যাহত রেখেছিলেন। তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না পরিণতির দিকে। মুসলমান তো কুরআন শরীফ এমনিতেই পাঠ করে থাকে আর সে যুগের লোকেরা পাঠ করত আরো অনেক বেশি। তাদের মধ্যে কিছু লোকের ভাবনা জাগল যে, মক্কা বিজয় হওয়ার পর ইসলাম বিজয়ী হয়ে গেছে সুতরাং এখন আর আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করারও প্রয়োজন নেই এবং জিহাদেরও প্রয়োজন নেই। তাই এখন আমাদের ক্ষেত খামার, ব্যবসা-বাণিজ্যে মগ্ন হয়ে যাওয়া উচিত। ঐ সময় একজন জলীলুল কদর সাহাবী সায়্যিদিনা হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা. (যিনি ছিলেন রাসূল সা.-এর মেজবান তথা আতিথ্যকারী এবং মাওলানা শিবলীর ভাষায় বিশ্ব মেজবানের মেজবান অর্থাৎ হুজুর সা. পৃথিবীর অতিথি সেবক, যার মাধ্যমে গোটা পৃথিবী ইসলাম এবং হিদায়াতের নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁকে সেই মহামানবের অতিথি সেবক হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করেছেন।) তিনি বিষয়টি সহ্য করে নিতে পারেননি। তিনি বললেন, লোক সকল! তোমরা ঐ আয়াতটির মর্মার্থ আমার নিকট জিজ্ঞাসা কর। ঐ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল কেবল আমাদের আনসারদের ব্যাপারে। আর আমরা যতটা একে বুঝব অন্য কেউ ততটা বুঝবে না, কারণ আমাদের জন্যই এটি অবতীর্ণ এবং আমরাই ছিলাম এর প্রথম সম্বোধিত।

ঘটনা হল, মদীনাতে যখন ইসলামের আগমন হল এবং আমরা এর জন্য সার্বিক কুরবানী করতে শুরু করলাম, আমাদের সমস্ত সময় এর পিছনে ব্যয় করতে লাগলাম। আমাদের সমস্ত যোগ্যতা, শক্তি, সামর্থ্য এর জন্য কুরবানী করলাম, তখন আল্লাহর কুদরতে আমাদের কার্যক্রমও এর দ্বারা প্রভাবিত হতে লাগল। বাগানে পানি দেয়ার সময় থাকল না। দোকানে বসার সময় রইল না। বাড়ী ঘর নির্মাণ এবং কারবার বৃদ্ধি বা গতিশীল করার সময় ছিল না। তখন আমাদের মস্তিষ্কে এ কথাটি উঁকি মারল যে, কিছুদিন তো আমরা চোখ কান বন্ধ করে কাজ করেছি, আমাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি, কিন্তু যখন মুসলমান সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আল্লাহর ফজলে প্রত্যেক অঙ্গনে সৈনিক তৈরী হয়ে গেছে, তখন আমরা চিন্তা করলাম কিছু দিনের জন্য হুজুর সা.-এর নিকট থেকে ছুটি নেব এবং বলব যে, এখন আমরা একটু আমাদের কাজকর্মগুলোকে সামনে এগিয়ে নিই, এরপর আমরা আবারও অগ্রগামী হব।

আমরা স্থায়ীভাবে ছুটি নিচ্ছি না। এতটুকু চিন্তাই কেবল হৃদয়ের গভীরে উঁকি মেরে ছিল, সম্ভবত বিষয়টি তখন কারো মুখেও আসেনি আর হুজুর সা.-এর খিদমতে বিষয়টি পেশ করার তো অবকাশই হয়নি। উক্ত ধারণাটি

মনে উঁকি মারার সাথে সাথেই কুরআনুল কারীমের আয়াত অবতীর্ণ হল যে, 'তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর' আর ব্যয় করার অর্থ শুধু সম্পদ ব্যয় করার কথা ছিল না বরং জানমাল থেকে শুরু করে যোগ্যতা, শক্তি-সামর্থ এবং মনোযোগ সব কিছুই ব্যয় কর এবং তোমরা ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়ো না এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করো না, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলো না, নিজেদের গলায় ফাঁস দিও না।'

আয়াতটি ছিল বেত এবং চাবুকের ভূমিকায়। আমরা কম্পিত হয়ে উঠলাম, অস্থির হয়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, ইসলামের খিদমতের জন্য নিজের কাজকর্ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা আত্মহনন নয়। বরং ইসলামের ও নিজের পার্থিব চাহিদার প্রতি অধিক লক্ষ রাখা এবং এর দরুণ ইসলামী চাহিদায় ঘাটতি সৃষ্টি হওয়া– এটাই মূলত আত্মহনন।

ব্যক্তিগত এবং সমাজবদ্ধ উভয় প্রকার আত্মহত্যাই হারাম

আপনাদের জানা আছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগতভাবে আত্মহত্যা হারাম। এ মাসআলাটি সকলেরই জানা আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বিষ খেয়ে মরতে চায়, সে যতই অসুস্থ হোক না কেন এবং যতই অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করুক না কেন ইসলাম সর্বাবস্থাতেই এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে। কেউ এর অনুমতি দিতে পারে না। ইসলাম কোন ব্যক্তির আত্মহত্যা সমর্থন করে না, সে যতই প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হোক না কেন। তাহলে একটি জাতি বা একটি সমাজে আত্মহত্যার বিষয়টি ইসলাম কেমন করে অনুমতি দিতে পারে? এর কারণ সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে অন্যদের জান ও জীবন। যেহেতু এই উম্মতই শেষ উম্মত, এই সম্প্রদায়ই শেষ সম্প্রদায়, তারাই সমগ্র মানবতার জন্য বিরাট এক উপায়, যদি তারা ডুবে যায়, তাহলে গোটা বিশ্ব ডুবে যাবে আর যদি তারা রক্ষা পায়, তাহলে বিশ্ব ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলেও রক্ষা পেয়ে যাবে এবং আজকে যদি ডুবে যায়, কাল ভেসে উঠবে। এভাবেই আল্লাহ পাক মানবতার তরীকে সচল রাখবেন। কিন্তু যদি এ উম্মতের নৌবহর ডুবে যায় এবং এ উম্মত যদি নিজের গলায় নিজে ফাঁস দিয়ে স্বীয় জীবনকে ধ্বংস করে দেয়, তাহলে এটা সামাজিক আত্মহত্যা নয়, জাতিগত আত্মহত্যাও নয় বরং মানবতার আত্মহত্যা এবং এটা শুধু গোটা দেশের আত্মহত্যা নয় বরং গোটা পৃথিবীর আত্মহত্যা।

ভারতীয় মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধের পরীক্ষা

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আপনারা তকরীরও শুনেছেন, তদবীরও শুনেছেন। বিপদের কথাও শুনেছেন, নিষ্কৃতির কথাও শুনেছেন। এখন কথা হল কোন

আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি তো দূরের কথা, কোন সাধারণ মানুষও কি কল্পনা করতে পারে যে, একটি পরিপূর্ণ সম্প্রদায়, যারা ভারতের বুকে মানবতা ও ইসলামের বাণী পৌছিয়েছেন, মানুষ তৈরী করেছেন, যারা শিক্ষা দিয়েছেন তৌহিদের সবক, যারা শিক্ষা দিয়েছেন মানুষ হয়ে জমিনে বিচরণ করা, সেই সম্প্রদায়টি আজ একমাত্র তাদের কাল্পনিক আশঙ্কা এবং হীন স্বার্থের জন্য সমাজবদ্ধভাবে এবং সম্প্রদায়গতভাবে আত্মহত্যার শিকার হবে?

ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিণাম

বর্তমান মুসলিম জাতির সমস্যা হল এরা বিপদসংকুল পরিণামের কথা বুঝেও নিজস্ব স্বার্থ, সুযোগ সুবিধা, আরাম আয়েশ, বিলাসিতা সামান্য আয়, সামান্য উন্নতি এবং সাধারণ ভবিষ্যৎকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ মুসলমানদের ঈমানী দুর্বলতা এত দূরে পৌছে গেছে যে, এই ঝুঁকিটুকু বরণ করে নিতে রাজী নয় যে, পিতা স্কুলে গিয়ে বললেন, 'আমার সন্তান উর্দূ মিডিয়ামে বসতে ইচ্ছুক কিংবা উর্দূ শিখতে আগ্রহী তাকে উর্দূ শিখানোর ব্যবস্থা করা হোক।' কারণ তিনি (পিতা) নিজেই প্রস্তুত নন, তাঁর মন এ ব্যাপারে প্রস্তুত নয়, তাঁর ভাষ্য হল সন্তান যদি হিন্দী ছেড়ে উর্দূ পড়ে, তাহলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে না এবং অনুরূপ উন্নতি লাভ করতে পারবেন না। তার যেসব সহপাঠী হিন্দী মিডিয়ামে পড়ছে কিংবা হিন্দী শিখছে, তাদের তুলনায় পিছে পড়ে যাবে এবং সে বড় কোন চাকুরী পাবে না।

আপনারা বলুন তো! এ কথাগুলো কি ঈমানের সাথে সমন্বিত হতে পারে?

ঈমানী মূল্যবোধের দাবী

আমি সকালে বলেছিলাম, ঈমানের ন্যূনতম দাবী হল যদি মুসলমান ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পায় যে, আমার সন্তান ইসলামী পরিভাষা উপেক্ষা করে বিধর্মীদের পরিভাষা ব্যবহার করছে এবং কোন শব্দ উচ্চারণ করছে যেমন 'তাবাররক' না বলে; বলল, 'প্রসাদ' দিন। অনুরূপ মিলাদও বুঝে না, সীরাত মাহফিলও বুঝে না, বুঝে 'কথাকলি'। অমুকের ইন্তেকাল হয়েছে না বলে, বলে 'দেহান্ত' হয়েছে। তবে ঈমানের দাবী হল, যদি নিজের বাচ্চার মুখ থেকে এমন কোন ধ্বনি স্বপ্নযোগেও শুনতে পান, তাহলে চিৎকার করে উঠবেন এবং হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবেন, দ্রুত দৌড়ে যাবেন, পুরো বাড়িতে অস্থিরতা বিরাজ করবে যে, একি কথা! এ আবার কোন ধরনের মুসিবত এসে পড়ল! স্বপ্নের মধ্যে সাপে দংশন করেছে, তার বিছানায় কোথায় যেন বিচ্ছু ছিল ঢুস মেরে দিয়েছে, এতে কি আর হয়েছে?

হয়ত মুসলমান বলবে কিছুই হয়নি, আমি স্বপ্ন দেখেছি মাত্র, আর এটা তো জানা কথা যে, স্বপ্নে মানুষ অনেক কিছুই দেখতে পায়, সেগুলো বাস্তবের বিপরীত হয়ে থাকে। কিন্তু কথা হল

عشق است وہزار بدگمانی

ইশক আছে আরো আছে হাজারো কুধারণা।

যখন কোন জিনিসের সাথে মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যায় এবং যখন কোন জিনিসের গুরুত্ব হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন মানুষ তার কল্পনাতেই অস্থির হয়ে যায় এবং কখনও স্বপ্নের ঘোরে অশুভ পরিণতি চিৎকার ধ্বনি বের হয়ে যায় এবং তার আরামের ঘুম হারাম হয়ে যায়।

ইসলামের জন্য কোন প্রকারের আশঙ্কা মেনে নেয়া উচিত নয়

একজন মুসলমান তার সন্তানদের জন্য একেবারে সম্ভাব্য কোন আশঙ্কাকেও বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে না– এটাই হচ্ছে ইসলামের প্রথম স্তর। অর্থাৎ কুফর, শিরক, মূর্তিপূজা এবং আকীদা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, যদি এতটুকু আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন তো আমাদের ঈমান কতটুকু যথার্থ? হাদীসে এসেছে যে ব্যক্তির মধ্যে এ গুণটি থাকবে সে যেন ঈমানের বিরাট একটা স্তর লাভ করল।

সুতরাং সে (সন্তান) কুফরীর দিকে ধাবিত হতে পারে এবং এর সম্ভাবনা খুবই প্রতুল এ কল্পনা করে এতটা ভীত হবেন, যতটা ভয় পেয়ে থাকে মানুষ আগুনের মধ্যে পড়ে যাওয়াকে। যেমন– মনে করুন কোন ব্যক্তি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করল এবং এর মধ্যে তার সন্তানকে নিক্ষেপ করল, এতে কোন মাতাপিতার যতটা কষ্ট হবে, লোম হর্ষিত হয়ে উঠবে, চিৎকার করে উঠবে এবং শ্বাস বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে, এর চেয়েও অধিক কষ্ট হওয়া উচিত একজন মুসলমানের সন্তান ইসলামের দৌলত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং কখনো মুরতাদ হয়ে যেতে পারে এ কল্পনা করে। প্রত্যেক ভাইকে নিজ নিজ ঈমান ঠিক করে নেয়া উচিত। আমরা যতই নামায পড়ি না কেন, যতই মসজিদ নির্মাণ করি না কেন, যতই দান সদকা করি না কেন এবং আরো অগ্রসর হয়ে বলতে চাই যে, শতবার হজ্জই করি না কেন, পরিষ্কার শুনে রাখুন, যদি আমরা হজ্জের পরপর হজ্জ করে থাকি, বিরাট আরবী মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করে থাকি এবং বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনের সাথে সম্পর্কও

রেখে থাকি, কিন্তু তার সাথে যদি আমরা এতটুকু জিনিস মেনে নিই এবং এ সম্ভাবনাকে যদি গ্রাহ্য করে নিই যে, আমার সন্তান ইসলাম থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে, তাতে কি, সে তো পাবে মোটা অংকের বেতন, লাভ করবে উচ্চ পদের চাকরী, তাহলে আমি দীনের একজন তালেবে ইলম হিসাবে আপনাদের সামনে পরিষ্কার ঘোষণা দিচ্ছি- এ সমস্ত হজ্জ কিয়ামতের দিন আপনার কোন কাজে আসবে না এবং আপনাকে মাফ করাতে পারবে না।

দৈহিক মৃত্যু অপেক্ষা আত্মিক মৃত্যু অধিক বিপজ্জনক

আপনি ফরয নামায পড়বেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিক মত আদায় করবেন এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদাগুলো আদায় করবেন। যদি হজ্জ ফরয হয়ে থাকে হজ্জ আদায় করবেন। এরপর আপনি কোন নফল আমল করতে পারেন আর না পারেন, কোন তাসবীহ আদায় করতে পারেন আর না পারেন, পরিষ্কারভাবে বলছি এবং দীনের একজন মুখপাত্র হিসেবে বলছি, আপনার হৃদয়ের গভীরে এ কথা বদ্ধমূল হতে হবে যে, সমস্ত কিছুই যেমন আমার কাম্য, সন্তানের মৃত্যু হোক ঈমানের সাথে- এটাও আমার কাম্য।

অত্যন্ত সন্তাপের সাথে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ধরনের শক্ত ভাষা ব্যবহার করছি, কিন্তু আমি দীনের সামান্য যে বুঝটুকু অর্জন করেছি তার তাগিদে বলছি, আমার সীনার মধ্যে সামান্য যা কিছু আমানত রয়েছে তা আমাকে বাধ্য করছে এসব কথা বলতে। যাই হোক, আমি বলতে চাচ্ছি ইসলামের নিদর্শন হল যে, মানুষ তার সন্তানের দৈহিক মৃত্যুকে আত্মার মৃত্যুর উপর প্রাধান্য দিবে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করবে যে, তার শারীরিক মৃত্যু আট দশবারও ঘটতে পারে। কিন্তু একবারও ঘটতে দিব না তার ঈমান আকীদার মৃত্যু, মৌলিক মৃত্যু, আত্মিক মৃত্যু, যদ্দরুণ সে জাহান্নামে অনন্ত কাল পর্যন্ত জ্বলতে পুড়তে থাকবে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

খুবই কঠিন ভাষা, অত্যন্ত কষ্টের সাথে আমি শব্দগুলো উচ্চারণ করছি। আপনাদের নিকট আমি ক্ষমা চাচ্ছি। সন্তানধারী মাতৃকূলের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। ক্ষমা চাচ্ছি সন্তানওয়ালা মাতাপিতার নিকট কিন্তু ঈমানের দাবী হল আল্লাহ পাকের নিকট দুআ করতে হবে। হে আল্লাহ! ঈমান যদি ঠিক থাকে, ইসলামের পথে পরিচালিত হওয়া যদি এ সন্তানটির ভাগ্যে থাকে, কাল হাশরের ময়দানে যদি সে আল্লাহর রাসূলের সামনে মুসলমান হিসেবে দাঁড়াতে পারে এবং তাঁর সুপারিশের অধিকারী হতে পারে, তাহলে তাকে জীবিত রাখ, নচেৎ একে দুনিয়ার থেকে তুলে নাও-এটাই হচ্ছে ঈমানের চাহিদা।

আমাদের ঈমানী অবস্থা দুশ্চিন্তাজনক

তবে আমরা কোন পরিস্থিতির মধ্যে আছি? এতটুকু ক্ষতি আমরা সহ্য করে নিতে রাজি নই যে, আমাদের ছেলের বেতন দুই হাজারের ক্ষেত্রে দেড় হাজার হবে। উর্দূর প্রতি আমরা অসন্তুষ্ট, উর্দূর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের কোন সম্পর্ক নেই দীন-ধর্মের সাথে, সম্পর্ক নেই নামায রোযার সাথে। আল্লাহর একত্ববাদ, তাওহীদ এবং রাসূলের রিসালাত, কিয়ামত ও হাশরের প্রতি বিশ্বাস কোন জিনিসের সাথেই আমাদের সম্পর্ক নেই, এসবের প্রতি আমাদের সামান্যতম কোন আকর্ষণ নেই। আমাদের সন্তান লেখাপড়া সমাপ্ত করবে, কোন পদে অধিষ্ঠিত হবে-এটাই প্রত্যাশিত অথচ এরপর ফলাফল কি প্রকাশ পেয়ে থাকে তা আমাদের সকলেরই জানা আছে। সে মাতাপিতার খেদমত কতটুকু করে এবং কতটি পাঠ শিক্ষা করেছে মাতাপিতার খেদমতের বিষয়ে। আপনি তার দীনকে কুরবানী করেছেন শুধু এ জন্য যে, তার দ্বারা আপনার উপকার হবে আর সে কিনা আপনাকে শুধু আঘাত করে আর লাথি মারে।

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

না পেল খোদা প্রেম,
না পেল দেবতার প্রেম
এভাবে তার জীবন গেল।
আমও গেল, বস্তাও গেল,
এতে তার কি লাভ হল?

স্মরণ রাখবেন, আপনি যদি আপনার সন্তানদের দুনিয়াকে দীনের উপর প্রাধান্য দেন তাহলে আল্লাহ পাক তার ফলাফল আপনাকে আপনার জীবদ্দশায়ই দেখিয়ে দিবেন। আপনি ভয় পাবেন তার প্রত্যেকটা পয়সাকে, আপনি ভয় পাবেন তার রুটির টুকরাকে, সে যদি একটা সালাম করে, তাতেও আপনার ভয় লাগবে। এটাই আল্লাহর পক্ষ হতে তাৎক্ষণিক এবং প্রথম সাজা যা পার্থিব জীবনেই পেয়ে যাবেন। আর যে শাস্তি পরকালে পাবেন, তার বিবরণ আল্লাহ পাক কুরআনে পাকের মধ্যে স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, এসব সন্তান কিয়ামতের দিনে বলবে-

رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا. رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا.

সূরা আহযাবের মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের সন্তান-সন্ততি উপস্থিত হবে, তারা বলবে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের বড়দের এবং আমাদের নেতাদের এবং আমাদের মাতাপিতার কথা মান্য করে চলতাম। কথা মান্য করার অর্থ কি? যে পথে পরিচালিত করেছে সেই পথে চলেছি। কিন্তু তাঁরা আমাদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছে, যদ্দরুণ আমরা দীন থেকে বঞ্চিত হয়েছি। হে আল্লাহ! তাঁদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং আকাশ থেকে তাদের প্রতি অভিশাপের বৃষ্টি আচ্ছামত বর্ষণ করুন।

আমি পরিষ্কারভাবে বলছি ঈমানের দাবী হল সন্তানের সঙ্কটময় পরিস্থিতির পার্থিব অনুন্নতি, পকেট শূন্যাবস্থা, সর্বপ্রকার পদমর্যাদা ও ধনসম্পদ হতে বঞ্চিত থাকা এ সব কিছুই মেনে নেয়া যেতে পারে, আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে, কৃতজ্ঞতার সাথে মেনে নেয়া যেতে পারে কিন্তু একথা মেনে নেয়া যায় না যে, সে ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং কুফরী পথে পরিচালিত হবে বা মূর্তিপূজার জালে ফেঁসে যাবে অথবা সরাসরি শিরক এবং মূর্তিপূজার প্রতি তার বিশ্বাস জমে যাবে। যদি এতটুকু অনুভূতি বা ব্যথা অন্তরে না থাকে, তাহলে নিজের ঈমানের দিকে তাকান এবং জিজ্ঞাসা করুন আলেম ওলামা এবং মাওলানা মৌলভীদের নিকট যে, ঈমান অবশিষ্ট থাকল কি না?

সাহাবাদের ঈমান ও আমলের একটি উদাহরণ

আমি আমার মা বোনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি– হযরত খানছা রা.–এর অনেকগুলো পুত্র সন্তান ছিল। প্রত্যেককে ডেকে তিনি বললেন, রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলছে। বিষয়টি চাকরির বিষয় ছিল না, পানাহারের বিষয় ছিল না, বিষয় ছিল কেবল জীবন মরণের। যাদের জন্য মায়ের রাতের আরামের ঘুম হারাম হয়ে যায়, যে সন্তানকে মা সর্বদা সাথে সাথে রাখেন, যে সন্তানদের জন্য মা খানাপিনার কথাও ভুলে যান, অথচ আল্লাহর এই ঈমানদার বান্দী নিজের যুবক সন্তানদের ডাকলেন এবং বললেন, দেখ! আমি তোমাদেরকে লালন পালন করে বড় করেছিলাম এই দিনটির অপেক্ষায়, এখন তোমাদের সময় এসেছে ইসলামের জন্য জীবন দেয়ার। তাই আল্লাহর নাম নিয়ে রণাঙ্গনে চলে যাও। এরপর বাচ্চাদের আখেরী বিদায় দিয়ে দিলেন, তিনি

যেন তাদের কাফন পরিয়ে বিদায় দিলেন। এরপর রণাঙ্গন হতে সংবাদ আসতে লাগল এক একজনের শাহাদাতের। যখন সর্বশেষ ছেলের শাহাদাতের সংবাদ পেলেন তখন বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَكْرَمَنِىْ بِشَهَادَتِهِمْ আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করছি সেই মহান আল্লাহ পাকের যিনি আমার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছেন, ওদেরকে শাহাদাত দান করে।

নিজের বুকের উপর হাত রেখে বলুন তো এই হিম্মতটুকু কার মধ্যে আছে। বর্তমান এর অবকাশ নেই, আজ বলা হচ্ছে না যে, সন্তানদেরকে আখেরী বিদায় দিয়ে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিন। কোথায় যুদ্ধ? এবং তার অবকাশই বা কোথায়? কিন্তু বলা হচ্ছে এতটুকু যে, সন্তানদের ঈমান রক্ষার জন্য কিছু কুরবানী করুন। কিছু ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আপনার ঈমানটাকে কিছুটা প্রমাণ করুন। যদিও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, আত্মমর্যাদার হানি হয়, আর এদেশে এ জাতি কোন শ্রেণীর সম্মানই বা লাভ করতে পেরেছে, যার মধ্যে বিশেষ কোন ফাটল সৃষ্টি হবে।

আজ আপনাদের এখানে কোন কোন মহান ব্যক্তিত্ব সম্মানের অধিকারী হয়েছে বলুন তো? জাতির সম্মান বৃদ্ধি পায় ভিন্ন কিছুতে। কোন ব্যক্তি দেশের প্রেসিডেন্ট হল বা ভাইস প্রেসিডেন্ট হল এতে জাতির কোন সম্মান বৃদ্ধি পায় না, তাহলে সেই সম্মান, কোন সম্মান, যার মধ্যে ঘাটতি আসার সম্ভাবনা?

ব্যক্তি বিশেষের সম্মানের কোন গুরুত্ব নেই, যখন সমষ্টিগতভাবে সম্মান লাভ হয়, তখন জাতি সম্মানিত হয়, আর জাতি সম্মানিত হলে ব্যক্তিও সম্মানিত হয়। ইংরেজেরা যখন এদেশ শাসন করেছে, তখন তাদের শ্বেতাঙ্গ সৈনিকেরা যাদেরকে আমরা শৈশবে বলতাম এরা মানুষের প্রভু, অথচ এখন তাদের কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না। কোথায় গেল সেই ইংরেজ, যাদের ছিল জাঁকজমকপূর্ণ ঐতিহ্য, এর সামান্যও এখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যখন ছিল এদেশে তাদের ক্ষমতা, তখন তাদের প্রশাসনের সামান্য বেতনভুক্ত সাধারণ একজন চাকরিজীবী যে ইংরেজির দুটি অক্ষর পড়ার যোগ্যতাটুকুও রাখত না, তারও ছিল শাহী হালত। জাতির সম্মান বৃদ্ধি পায় তাদের কৃতিত্বের দ্বারা, তাদের কুরবানীর দ্বারা। সেই সম্মান কোন শ্রেণীর সম্মান যাতে বিরাট ঘাটতি আসবে বা ফাটল সৃষ্টি হবে?

ছেলে কমিশনারের পদ লাভ করবে, আই.এ.এস হবে, পুলিশ হবে তাঁর নেতিবাচক দিকটাকে এবং এ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কিছুটা ফারাক সৃষ্টি হবে, ইহা যদি আপনি বরদাশত করে নিতে না পারেন, তাহলে কোথায় সেই ঈমান?

এরপরও ঈমান আছে বললে কেবল এতটুকু হতে পারেন যে, আপনারা ঈমানের দাবী করে থাকেন এবং ঈমান ঈমান করতে থাকেন।

ঈমানের ন্যূনতম দাবী তো পূরণ করবেন

আপনাদের নিকট আমার জিজ্ঞাসা হল আপনারা নিজ নিজ সন্তানদের ঈমানকে রক্ষা করার জন্য উপরোক্ত দিক নির্দেশনার প্রতি কতটুকু আমল করবেন, এটাই মূল কথা এবং এ কথার ওপরই আলোচনা শেষ করছি। তকরীর করার পর্যাপ্ত সুযোগ নেই আর যা কিছু এখন বললাম এগুলোও এক প্রকার স্পৃহা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে, নচেৎ এই সীমিত সময়ের মধ্যে তা বলার অবকাশ ছিল না এবং পর্দার আড়ালে অবস্থানরত আমার সকল মা বোন ও রমণীগণ এবং যেসব ভাইয়েরা আমার সামনে উপবিষ্ট তারা আজ সিদ্ধান্ত নিবেন এবং এখান থেকে একথা নিজ অন্তঃকরণে গেঁথে নিয়ে যাবেন। আজ সকাল থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং যে অধিবেশন চলছে তাতে সকলের কাছে একই পয়গাম ও একই দাওয়াত যে, ঈমানকে মূল্যায়ন করবেন। ঈমানের মূল্য অনুধাবন করবেন ঈমানের একেবারে প্রাথমিক এবং ন্যূনতম দাবীটা অন্তত পূর্ণ করবেন। আর তা হল, প্রত্যেক মুহূর্তের জন্য নিজ সন্তানদের ঈমানকে রক্ষা করতে হবে এবং নিজ বংশধরকে খাঁটি মুসলমান বানিয়ে রাখতে হবে এবং এর জন্য যত বড় দাবীই হোক না কেন, সর্বাবস্থাতেই সেগুলো পূরণ করতে হবে।

ইয়াকুব আ. এর সুন্নাতকে জিন্দা করা প্রয়োজন

একটা কথা, যে কথাটি সমস্ত কথার মূল এবং সার সংক্ষেপ, তা হচ্ছে আল্লাহ পাক আপনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং সন্তান-সন্ততিরূপে যে নিয়ামত দান করেছেন সর্বাবস্থায় তার শোকর আদায় করা, আর এ নিয়ামতের শোকর হচ্ছে তাদেরকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে পরিপূর্ণ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে, দুআ করতে হবে এবং চেষ্টা সাধনা করতে হবে, যখন যে ধরনের কুরবানী প্রয়োজন হয় সেটা করতে হবে এবং কমপক্ষে আপনার ইচ্ছায় এবং আপনার সন্তুষ্টিক্রমে যেন তারা ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে না পড়ে। এরপর হচ্ছে তার ভাগ্য এবং আল্লাহর ইচ্ছা, যেহেতু তিনি পরাক্রমশালী। আর আল্লাহর ফয়সালা এমন, যা ব্যাহত করার সাধ্য না আপনাদের আছে, না আমাদের আছে নবীগণও ব্যাহত করতে পারেননি। একজন নবী তাঁর পিতাকে পথে আনতে পারেননি এবং একজন তাঁর ছেলেকে ইসলামের ছায়াতলে আনতে পারেননি, তাহলে আপনারা কিভাবে পারবেন? এটা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর ইচ্ছাধীন।

কিন্তু আপনার আমার কর্তব্য হচ্ছে এর প্রতি আমাদের যথাসাধ্য শক্তি ব্যয় করতে হবে যেন আমাদের হুঁশ থাকতে এ ধরনের কোন আশংকা সৃষ্টি না হয়। যেমন হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে স্বীয় সন্তান পুত্র ও নাতীদেরকে একত্রিত করলেন এবং বললেন হে আমার বৎসরা! তোমরা আমার নিকট স্বীকৃতি দান কর আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার ইবাদত করবে?

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

'তোমরা কি স্বয়ং তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুব আ. জীবন সায়াহ্নে পৌছেছিলেন এবং যখন তিনি স্বীয় সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা আমার (মৃত্যুর) পরে কোন জিনিসের ইবাদত করবে? তারা সকলে (সমস্বরে) উত্তর দিল যার ইবাদত করতেন আপনি এবং আপনার পূর্বসূরীগণ ইবরাহীম আ., ইসমাঈল আ. ও ইসহাক আ. অর্থাৎ তিনিই লা-শরীক একক মাবুদ এবং আমরা তাঁর ইবাদতের ওপরই অটল থাকব।' (সূরা বাকারা, রুকু-১৬)

দেখ আমার ছেলেরা! আমার নাতী পৌত্ররা! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত না হতে পারব যে, তোমরা আমার বিদায়ের পরে কোন পথে চলবে এবং কার ইবাদত করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কবরের সাথে, জমীনের সাথে আমার পিঠ মিশবে না।

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

তারা ছিল নবীদের আওলাদ! তারা বলল, আব্বাজান, দাদাজান, নানাজান! আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আপনি যে শিক্ষা আমাদের দান করেছেন, তা কখনো ভুলব না। আমরা আপনার এবং আপনার পিতা হযরত ইসহাক আ. এবং আপনার চাচা হযরত ইসমাইল আ. এবং আপনার দাদা হযরত ইবরাহীম আ.-এর বাতলানো পথের ওপর চলব এবং ঐ এক রবের ইবাদত করব। তখন হযরত ইয়াকুব আ.-এর মনে প্রশান্তি আসল।

কখনো তিনি একথা বলেননি যে, দেখ বৎস! অমুক স্থানে আমি কিছু পয়সা প্রোথিত করে রেখেছিলাম, অমুকের নিকট আমি এত টাকা ঋণী আছি, অমুক স্থানে এতটুকু ভূমি রেখে যাচ্ছি, এতটুকু খামার রেখে যাচ্ছি, এগুলো

সব তোমরা নিয়ে নিবে। একথাও তিনি বলেননি যে, তোমরা মহব্বত ও একতার সাথে থাকবে, যেমনটি বলে থাকেন অনেক স্নেহপরায়ণ পিতা, ওসব কিছুই বলেননি, একটি কথাই মাত্র বলেছেন مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِى (তোমরা কার ইবাদত করবে আমার বিদায়ের পর?)

এটাই নবীগণের আদর্শ এবং এটাই আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একথার ওপরই আমি আমার আলোচনা শেষ করছি এবং দুআ করছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঈমানের মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করুন এবং ঐ আশংকাসমূহের অনুভূতি দান করুন, যার থেকে বেঁচে থাকার কথা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বর্ণনা করেছেন এবং কুরআনে কারীমের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

'হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে (জাহান্নামের) ঐ অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানী হচ্ছে মানুষ এবং পাথর। যেখানে নির্ধারিত রয়েছে কর্কশ আচরণ বিশিষ্ট কঠোর ফিরিশতা, যারা কোন বিষয়ে আল্লাহ পাকের নির্দেশের কোনরূপ অমান্য করে না এবং যা কিছু তাদেরকে নির্দেশ করা হয়, সাথে সাথে সেগুলো প্রতিফলিত করে।' (পারা-২৮, সূরা তাহরীম, রুকু-২১)

'হে ঈমানদারগণ! নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর এমন জাহান্নামের অগ্নি থেকে, যার জ্বালানী মানুষ ও পাথর আল্লাহ পাক আমাদের এবং আপনাদেরকে ঈমানের যে দৌলত কেবল তার অশেষ ফজল ও করমে নবীগণ আওলিয়া এবং স্বীয় মাকবুল বান্দাদের মাধ্যমে বিনা শ্রমে আমাদের দান করেছেন, তার ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আমাদের জীবনে এবং আমাদের সন্তানদের জন্যেও এটি (ঈমান) যথাসাধ্য হিফাজত করতে হবে যতক্ষণ হুঁশ থাকে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা।

হে আল্লাহ! আমাদের ঈমানকে হিফাজত করুন। আমাদের সন্তানদের ঈমানকেও হিফাজত করুন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও হিফাজত করুন এবং আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সিরাতে মুসতাকীমের ওপর অটল রাখুন। আমাদের এ ধরা হতে যখন তুলে নিবেন, তখন ঈমানের সাথে তুলে নিবেন।

হে আল্লাহ! আমাদের সন্তানদেরকেও, অনাগত সন্তানদেরকেও, সেই সন্তানদের সন্তানদেরও আর আওলাদের আওলাদদেরকেও ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখুন এবং সেই পথে পরিচালিত করুন যেই পথ বাতলে দিয়েছেন আপনার নবী সা. এবং যা নিয়ে এসেছেন আপনার রাসূল সা.।

আর তাদেরকে দুনিয়াতে ঈমানের ওপর অটল রাখুন ও ঈমানের সাথে তুলে নিন এবং তাদের হাশর নাশরও ঈমানের সাথে করুন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অনুবাদ : মাওলানা মুজাহিদুর রহমান শিবলী

ইলম ও দীনের খেদমত

[২৭/০২/১৯৮৩ ঈসায়ী (ইন্ডিয়ার উত্তর প্রদেশে অবস্থিত) বস্তী শহরে 'দীনী তা'লীমী কাউন্সিল'-এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত একটি মহাসমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য মুসলিম বিশ্বের অনন্য ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র. শুভাগমন করেছিলেন। হযরতের শুভাগমন উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন প্রান্তরে অনেক প্রোগ্রাম রাখা হয়েছিল, তন্মধ্যে এক আজীমুশ্বান প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৭/০২/৮৩ ঈ. সকাল ৮টায় দারুল উলূমুল ইসলামিয়াতে।

কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। তেলাওয়াতের পর কুতুবখানা দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ-এর পরিচালক এবং দারুল উলূমূল ইসলামিয়া বস্তী-এর সভাপতি প্রাথমিক আলোচনা রাখেন। এরপর হযরত মাওলানা নদভী র.-এর খিদমতে দারুল উলূমুল ইসলামিয়াহ এর পক্ষ থেকে অভিনন্দনপত্র পেশ করা হয়। সর্বশেষ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র. তালাবা, আসাতিজা এবং শহরের সম্মানিত সুধীজনদের উদ্দেশ্যে তাকরীর পেশ করেন। উক্ত বয়ানটি পরিপূর্ণভাবে টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে সংকলন করে সর্বসাধারণের ফায়দার জন্য প্রকাশ করছি। -সংকলক]

মানবতার সুপ্ত প্রতিভা

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে মাটির একটি মূর্তি মাত্র। নিজস্বভাবে সে কোন যোগ্যতার অধিকারী নয়। সৃষ্টিগতভাবে সে নিতান্তই দুর্বল, জ্ঞানশূন্য, যোগ্যতাশূন্য, গুণশূন্য, মানমর্যাদা বলতে তার মধ্যে কিছুই নেই। তার মধ্যে যা কিছু কর্মশক্তি এবং আমলের তাওফীক সৃষ্টি হয় এবং এর থেকে এমন কিছু যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা ও উচ্চতার পরিমাপ অনেক মহামানবের মেধাও নির্ণয় করতে পারে না এবং অনেক বড় বড় কবি সাহিত্যিকের কল্পনা শক্তিও সে পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয় না। মূলতঃ এ সমস্ত

কিছুই একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁরই নির্দেশের ফল এবং এটাই বাস্তবতা। সে বিষয়ই বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতটিতে-

يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ.

তিনি ইচ্ছা করলে প্রাণহীন মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে থাকেন। আর ইচ্ছা করলে প্রাণ সঞ্চার না করে অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে কার্যসাধন করতে পারেন।

جو نہ تھے خود راہ پر غیروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

বিপথগামী ছিলেন যারা, পথ দেখাতে শিখলেন তারা
কার ইশারায় হয় যে এমন ভেবে দেখছেন কী?
মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার, সে যে কি আজব ব্যাপার!
কার ইশারায় ঈসা মসীহ করতেন এমন জানেন কী?

নবী আ.-এর কার্যক্রমই যদি হয় এমন অলৌকিক তাহলে আল্লাহর কুদরতের ব্যাপারে তো কোন প্রশ্নই আসে না। বাস্তব কথা হল সমস্ত প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তিনি যার দ্বারা ইচ্ছা করেন তার দ্বারাই কাজ নেন, যখন ইচ্ছা করেন তখন নেন এবং যত ইচ্ছা করেন তত নেন। এ সমস্ত বিষয় এবং সীমারেখা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

রহমতের সে বারিধারা আজও প্রবাহমান

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ র. এবং তাঁর সহচরবৃন্দ ও তাঁর দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, যার মধ্যে হযরত মাওলানা সাইয়েদ যাফর আলী সাহেব বান্ধবী র. প্রমুখ সুধীজনের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- এ সকল ব্যক্তিত্বের সার্বিক খেদমত এবং দীনী ও দাওয়াতী চেষ্টা ও প্রয়াস মূলত আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর ইচ্ছার কারিশমা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ পাক তাঁর এ প্রিয় বান্দাগণের দ্বারা কাজ নিয়েছেন এবং তারা দীন জিন্দাকরণের আজীমুশশান দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেক মানুষের দীল জিন্দা করেছেন। অনেক চক্ষুকে জ্যোতিস্মান করেছেন, অনেক রূহের মধ্যে ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যাদের সাধনায় মানবতার গগন মূর্খতার মেঘমালা হতে মুক্ত হয়েছে, ইলমের বারিধারা প্রবাহিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্নপ্রান্তে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঘরের পরিবেশ এবং

ভেতর বাহির আল্লাহর পবিত্র নাম ও তাঁর যিকির দ্বারা নূরানী হয়ে উঠেছে। এগুলো সবই মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং کن فیکون এর কারিশমা। তিনি যার দ্বারাই ইচ্ছা করেন তার দ্বারাই কাজ নেন।

বড় বড় বুযুর্গদের নাম উল্লেখ করার কারণে অনেক সময় প্রাকৃতিকভাবে বা প্রতিক্রিয়া হিসাবে এ কথা হৃদয়ের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে এবং মানুষের মনে কিছু নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, বর্তমান এমন বুযুর্গ আর জন্ম নিবে না, এমন ব্যক্তিত্বও আর আসবে না, এ ধরনের কাজও আর হবে না। মহামনীষীদের জীবনী পড়ে নৈরাশ্যের শিকার হওয়া কুদরতের কানূন সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচয়। পক্ষান্তরে তাঁদের জীবনী হতে আমাদের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনার কিছু উপকরণের সন্ধান মেলে এবং কিছু কার্য সাধন করার স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণ সব কিছুই যখন আল্লাহ পাকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল তখন নৈরাশ্যের কি আছে?

তবে (আমার দ্বারা যে, আল্লাহ কাজ নিবেন) তার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা জরুরী, দ্বিতীয়তঃ পাত্রটি নিম্নরূপ হতে হবে–

دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر

'সেই পাত্রে ঢুকবে শরাব যেই পাত্র থাকবে নিচু'

সাফল্যের জন্য কয়েকটি শর্ত

সাফল্যের জন্য প্রয়োজন কিছু ইখলাস, কিঞ্চিৎ সাধনা ও তিতিক্ষা, সর্বোপরি মজবুত প্রতিজ্ঞা। যখন উক্ত গুণাবলির সমাবেশ ঘটবে এবং সাথে সাথে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অনুকূলে হবে এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় ও সংযোগ সৃষ্টি হয়ে গেলে সাফল্য নিশ্চিত। এ ধরনের মুখলিস ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে বড় ধরনের কোন বিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে। যখন একটি ক্ষুদ্র দানা উর্বর ভূমিতে পড়ে তখন সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল ক্ষেত্র আত্মপ্রকাশ করে অথচ এ শস্যদানার মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে! আপনি যদি এটাকে হাতের উপর রেখে উড়িয়ে দেন তাহলে তা উড়ে যাবে। আর এই মাটি যার মধ্যে না স্বাদ আছে, না শক্তি আছে এবং জীবন দানের ক্ষমতা তো অনেক দূরের কথা, তার নিজের দেহের মধ্যেইতো কোন জীবন নেই। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'জমীন ছিল মৃত আমি তার উপর পানি বর্ষণ করলাম, তখন اهتزت وربت সজীবতা ও উর্বরতা লাভ করল।' তাহলে একটি দানাকে সঠিক ভূমিতে ফেলে দিলে এমন একটি খামার সৃষ্টি হতে

পারে যা আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাই, তবে মানব হৃদয়ে যদি শুধু এতটুকু গুণ সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহর নিয়ামতকে অবমূল্যায়ন করবে না এবং আল্লাহর নিয়ামত সাদরে গ্রহণ করে নেয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে, তাহলে সে কি কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারবে না? তার থেকে কি আজব আজব বৈচিত্র্য প্রকাশ পেতে পারে না?

পূর্বসূরীদের আলোচনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া

বুযুর্গদের নাম উল্লেখ করলেই সাথে সাথে মানুষের মনে এ প্রতিক্রিয়াটি প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে যে, লোকে বলে ব্যাস! এখন তো তাহলে মানুষকে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা উচিত এবং নিরাশ হয়ে যাওয়া উচিত কারণ, এখন আর না জন্ম নিবে এমন ব্যক্তিত্ব, না তাদের গঠনকারী, না তাদের তরবিয়তকারী। এখন আর কোথায় মিলবে শাহ আব্দুল আজীজ র., কোথায় মিলবে শাহ আব্দুল কাদের র., যাদের স্নেহপূর্ণ ক্রোড়ে লালিত পালিত হবে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ র. আর কোথায়ই মিলবে তাদের বংশধর পবিত্র আত্মাগণ? আর এ কাজই বা কার দ্বারা হবে?

এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা ও প্রতিক্রিয়া নিতান্তই ভুল এবং ক্ষতিকরও বটে। পক্ষান্তরে এর ক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল এমন যে, আল্লাহ পাক যদি তাঁর দীনকে জিন্দা রাখতে চান এবং নিশ্চয়ই এমন চান আর এই ধর্মই সর্বশেষ ধর্ম, এর কোন বিকল্প কিংবা স্থলাভিষিক্ত নেই। সুতরাং আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ না হয়ে বরং তাঁর রহমতের প্রতি নতুন নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگراں ہم می کنند آنچہ مسیحا می کرد

খোদার মদদ মোদের কাছে আসে যদি ফিরি
ঈসা মসীহ আ. করেছেন যাহা আমরাও তা করতে পারি।

আল্লাহর তাওফীক আসে প্রত্যেক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে

আমরা একথা বলি না যে, ঠিক ঐ মাপেরই ব্যক্তিত্ব জন্ম নিবে, সম্ভবত তার প্রয়োজনও নেই। আল্লাহ পাক প্রত্যেক যুগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করেন এবং کل یوم هو فی شان হিসাবে তাঁর কর্ম সময়ভেদে পার্থক্য হয়ে থাকে। প্রত্যেক যুগে যে একই পদ্ধতিতে কাজ হবে এমন নয়। তবে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃত পক্ষে আমাদের এসব খড়কুটা নির্মিত

মাদরাসাসমূহ এবং দীক্ষালয় ও খানকাগুলো এমন সব ব্যক্তিত্ব তৈরী করেছে যারা থাকতেন ঠিকই ঝুঁপড়ির মধ্যে কিন্তু ধনবান সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ তো দূরের কথা রাজা বাদশাদেরকেও খাতির করতেন না।

আমাদের তৈরী এসব মাদরাসা ও খানকাসমূহ উচ্চ চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তৈরী করছিল, যারা ফকিরের চাঁটাই এর উপর বসেও রাজা বাদশাদেরকে খাতির করেননি। যারা নিজের পোশাকে তালি লাগিয়ে পরেছেন তথাপি শাহী শেরওয়ানীতে হাত লাগাননি। এ ধরনের ব্যক্তিত্বের আজও প্রয়োজন, প্রয়োজন খোদার প্রেমে মত্ত এ জাতীয় দরবেশের। আর তাদের জন্মের আশা করা যায় কেবল খড়কুটা নির্মিত নিকেতন এবং সাদাসিধা স্থানে। আপনারা ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ করে সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে যাদের নাম শুনে থাকেন এবং পড়ে থাকেন তারা হচ্ছেন সেসব ব্যক্তিত্ব, যারা নিম্নবিত্তদের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, সাদাসিধে পরিবেশে গড়ে উঠেছেন, যাদের জীবনে এমনও একটি মুহূর্ত গিয়েছে, যখন তাদের উদরপুরে আহার জোটেনি এবং মাতাপিতাও তাদের সন্তানদের আহার যোগাতে পারেননি। এক সময় সেই ঝুঁপড়ি হতে আত্মপ্রকাশ করেছে এমন উজ্জ্বল প্রদীপ, যা আলোকিত করেছে গোটা বিশ্বকে।

নিজের দিকে তাকাবে, শূন্য হস্ত বিধায় দুঃখ নিবে না

বর্তমান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে আপনারা আপনাদের পুঁজি ছোট দৃষ্টিতে দেখবেন না এবং তাদেরকে পরিমাপ করবেন না ঐ সমস্ত দারুল উলূম মাদারিস এবং জামেয়াগুলোর সাথে যেগুলোর উপাখ্যান আপনারা শুনে থাকেন এবং যেগুলোকে মানুষ মনে করে চূড়ান্ত সাফল্য এবং চূড়ান্ত স্বপ্ন, আপনারা ওদের মূল্যায়ন করবেন এবং চেষ্টা করবেন যেন তাদের মধ্যে এমন কোনো গুণ সৃষ্টি হয় যার উসিলায় আল্লাহ পাকের রহমত তাদের অনুকূলে এসে যায়। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের মধ্য হতে কাউকে নির্বাচন করে নেন এবং প্রত্যেক যুগের ন্যায় এ যুগের আঁধারাচ্ছন্ন পরিবেশে ইলম ও ইসলামের এক মহান জ্যোতি সৃষ্টি হয়ে যায়।

নেপালের সমগ্র এলাকা এবং এ পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে এ বস্তী জেলার জনগণ আমার প্রতি খুবই ভালবাসা রাখে এবং এ অঞ্চলের মানুষের সাথে আমার পুরনো সম্পর্ক রয়েছে, যেমন মাওলানা মুরতাজা দা. ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন এবং অভিনন্দন পত্রেও এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং এখানে আগমনের জন্য বাস্তবিক পক্ষে কোন অভিবাদন বা অভিনন্দন পত্র

আমার প্রাপ্য ছিল না। এর চিন্তাও আমি করিনি, তবুও এটা এ যুগের একটা প্রথায় পরিণত হয়েছে। মোটকথা আমার কোনো ইস্তেকবাল বা শুভেচ্ছা স্বাগতমের প্রয়োজন নেই। যেমন– গতকাল আমার এক প্রিয়জন বলেছেন যে, আমি বাড়ীতে এসেছি। আর বাস্তবেও তো–

ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست

প্রত্যেক রাজ্য মোদেরই রাজ্য
যেহেতু সেটা খোদার রাজ্য

যারা দীনের সেবক তাদের বিষয় এমনই, যেখানেই তারা যাবে, সেখানেই তাদের বাড়ী। যেখানে যাওয়া তাদের জন্য ফরজ এবং খেদমত করাও তাদের জন্য ফরজ।

ইখলাস এবং ব্যথাওয়ালা লোকের অভাব

আমাদের ওপর বিশেষ একটা দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ পাকের নিকট দুআ করি এবং আপনারাও দুআ করবেন যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ দায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেন এবং এ মাদরাসাটিকে উন্নতি দান করেন। এ মাদরাসা থেকে যেন সেসব ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে দেন যারা পূরণ করতে পারবে মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। এ যুগে না আছে আলেমের অভাব, না আছে লেখক-চিন্তাবিদের অভাব, অভাব আছে শুধু ব্যথাওয়ালা লোকের, সেসব ব্যক্তিত্বের, যাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকবে বাস্তবিক যন্ত্রণা, যেমনটি যন্ত্রণা ছিল সাইয়েদ আহমাদ শহীদ র.-এর সহচরবৃন্দের হৃদয়ে, যেমন যন্ত্রণা ছিল হযরত মাওলানা সাইয়েদ যাফর আলী র. এর হৃদয়ে।

তাঁদের হৃদয়ে চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা ছিল এমন পর্যায়ের যে, গ্রামে গ্রামে ঘুরাফেরা, মানুষকে তোষামোদ করা, দ্বারে দ্বারে যাওয়া, দীনের দিকে আহ্বান, সুন্নাতকে উজ্জীবিত করা, বিদআতী ও জাহেলী কুপ্রথা এবং বদ-আকিদাসমূহ বিদূরিত করা, এ সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা ছিল পানিহীন মাছের মত অস্থির। তাদের জীবন এভাবেই কেটেছে এ জাতীয় অস্থিরতা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। বর্তমান সবচেয়ে বড় অভাব হল সেই যন্ত্রণার আসবাবের কোন অভাব নেই। আমরা আসবাবেরই সবচেয়ে বেশি সমাগম দেখতে পাচ্ছি, সর্বত্র কেবল জাহেরী আসবাবের চাকচিক্য। আর অনেক জায়গায় তো এখন বস্তুবাদ এবং কুফরী নীতির সাথে তালমিল রেখে চলা হচ্ছে এবং আসবাবের পিছে লাগতে লাগতে মৌলিক বিষয়টিই পিছে

পড়ে যাচ্ছে। সুতরাং এ সময় আসবাবের চেয়ে বেশি প্রয়োজন ব্যথা এবং বাহ্যিক রূপরেখার চেয়ে বেশি প্রয়োজন বাস্তবতা ও অস্থিরতা।

ইখলাসের বরকতসমূহ

আল্লাহ পাক যদি আপনাদের অত্র অঞ্চলে দীনের কর্ণধার দুজন ব্যক্তিত্ব তৈরী করে দেন, যাদের হৃদয়ের মধ্যে মানুষের মূর্খপনা, বদকাজ এবং বদআকীদার ব্যাপারে যন্ত্রণা ও অস্থিরতা থাকে, তাহলে গোটা এলাকা সংশোধন হয়ে যেতে পারে এবং কমপক্ষে ততটুকু হবে যেমন ছিলেন মরহুম কাজী আদীল আব্বাসী সাহেব, যার দিলের ওপর একটি মাত্র আঘাত লেগেছিল যে, এমনই যদি কাটতে থাকে আমাদের দিনগুলো এবং এমন সরকারী শিক্ষানীতি যদি চালু থাকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি এমন শিক্ষার ক্রোড়ে পরিপুষ্ট হতে থাকে, তাহলে ওরা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যাবে এবং শুধু নেতিবাচকভাবে দূরে সরে যাবে না বরং ইতিবাচকভাবে হিন্দুদের বদআকীদা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। অতঃপর তার এ ব্যাকুলতা এবং চিন্তা-চেতনা দীনী শিক্ষার এ বিপ্লবকে অস্তিত্ব দান করেছে।

আমি আপনাদের সামনে উপমা হিসেবে পেশ করলাম আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্য হতে এমন একজন ব্যক্তিত্বের নাম, যার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ক্ষেত্র ছিল অনেক প্রশস্ত এবং তিনি ভারত উপমহাদেশের আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দীপ্ত হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন সংকীর্ণ পরিসর এবং এর মধ্যেই প্রয়োগ করেছেন নিজের সার্বিক যোগ্যতা ও প্রয়াস। যার ফলাফল আজ আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান এবং এখনই দেখতে পাব আপনাদের এই বস্তী জেলায় কী ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং কোন কোন জায়গা থেকে মানুষের সমাগম ঘটবে। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হামেদ সাহেব শুভাগমন করেছেন, আরো বিভিন্ন স্থান থেকে বড় বড় পণ্ডিত, চিন্তাবিদ, মুসলমান এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং আমাদের বর্তমান প্রয়োজন কেবল এ জিনিসটিই যে, এমন কোন আল্লাহর বান্দা তৈরী হয়ে যাবে, যার হৃদয়ের মধ্যে থাকবে যন্ত্রণা।

جہانے را دگرگوں کرد یک مرد خود آگا ہے

একজন যোগ্যতাসম্পন্ন আত্মসচেতন লোক (স্বল্প সময়ে)
পৃথিবীর রং বদলে দিতে পারে।

বিশ্বব্যাপী বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এখান থেকে আরম্ভ করে আমেরিকা পর্যন্ত এবং মাত্র কয়েকদিন হল রাশিয়াতেও একটি জামাত গিয়েছে। পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এবং উত্তর মেরু হতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত একটি বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

এ ধরনের এক সাড়া জাগানো বিপ্লব সৃষ্টি করেছে তাঁর হৃদয়ের অস্থিরতায়, এ জিনিসটির আজ প্রয়োজন। যতদিন পর্যন্ত বড় বড় বিল্ডিং না হবে, বড় বাজেট না হবে এবং অনেক প্রচার না হবে সাহিত্য এবং ম্যাগাজিন না হবে এবং জামেয়া পর্যায়ের কোন মাদরাসা না হবে, ততদিন পর্যন্ত কোন কিছু করা সম্ভব নয় এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা ছাড়তে হবে। এগুলো সবই কল্পনা প্রসূত ধ্যান ধারণা মাত্র। বাস্তব কথা হল, মূল জিনিস হচ্ছে প্রতিজ্ঞা, অস্থিরতা এবং ব্যাথ্যা।

আমি দুআ করি আল্লাহ পাক যেন এ মাদরাসার মধ্যে সে সব আত্মা এবং মূল জিনিস সৃষ্টি করে দেন যদ্দারা দীনী শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে পারে।

অনুবাদ : মাওলানা মুজাহিদুর রহমান শিবলী

জীবনের চেয়েও ঈমান প্রিয়

[পূর্ণাঙ্গ এবং সংক্ষিপ্ত–এ তকরীরটি হযরত মাওলানা নদভী র. পেশ করেছিলেন 'দীনী তা'লীমী কাউন্সিল'–এর তত্ত্বাবধানে ১৬/১২/৯৩ ঈ. রাত ৯টায় দারুল উলুমুল ইসলামিয়া, বস্তিতে অনুষ্ঠিত এক মহা সমাবেশে।]

হযরত মূসা ও খিজির আ.–এর ঘটনা এবং ঈমানের মর্যাদা ও মূল্যায়ন

আমার কয়েকটি কথা বলার আছে। একটি হচ্ছে যদি আমি আপনাদের সাথে কোন চুক্তি করতাম, তাহলে একটি চুক্তি করতাম যে, আপনারা এ অনুভূতি ও উপলব্ধিকে সজীব করে রাখবেন, ঈমান জান থেকেও অধিক প্রিয় এবং আমাদেরকে একথা ভালভাবে বুঝতে হবে যে, সন্তানদের জীবনে সুস্থতা থেকে তার ঈমান অধিক প্রিয়, ঈমানই অধিক মূল্যবান। এ প্রসঙ্গে আপনাদের সামনে দুটি আয়াত পেশ করছি দলীল হিসেবে এবং যখনই আমি পাঠ করি, তখনই পেরেশান হয়ে যাই আর সে পেরেশানী দূর হয় না। কিন্তু আমার সন্দেহ এবং ধারণা হচ্ছে, খুব কম লোকই এর থেকে সঠিক ফল বের করতে সক্ষম হয়েছে। আসলাফে কেরাম এবং মুফাচ্ছিরীনে ইজামের খেয়াল নিশ্চয় সে সব বিষয়ের দিকে গিয়ে থাকবে, যে দিকে আমাদের খেয়াল পৌছেনি, বর্তমানে অধ্যায়নকারীদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই এই ফল বের করে থাকে।

কুরআনে মজীদের সূরা কাহাফ-এর শেষ দিকে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত খিজির আ. একটি ছেলের জীবন কেড়ে নিলেন আর এমন একটি কাজ করলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একজন আজীমুশশান পয়গম্বর হযরত মূসা আ. এর উপস্থিতিতে এবং তাঁর সঙ্গী হয়ে। হযরত মূসা আ. যখন হযরত খিজির আ.কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি বাচ্চাটার সাথে এ-কি আচরণ করলেন? তার অপরাধ কি ছিল? এবং কোন অপরাধ থাকলে সেটা এমন কি অপরাধ যদ্দরুণ তার জীবনটাই কেড়ে নিতে হবে? হযরত খিজির আ. উত্তরে বললেন যে, তার মাতাপিতা দুজনই ছিল ঈমানদার ও নেককার এবং এ শিশুটি তাদের জন্য হত ফেৎনার কারণ। যদি এ সন্তানটি জীবিত থাকত, তাহলে তার মাতাপিতার ঈমানের জন্য আশঙ্কা সৃষ্টি করত এবং

কুফরীতে বাধ্য করত, এজন্য আমি তাদেরকে এ ধরনের আশঙ্কা থেকে রক্ষা করলাম এবং তার জীবন ছিনিয়ে নিলাম, যাতে আল্লাহ পাক এর পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করেন।

আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বৃহৎ থেকে বৃহত্তম স্বাধীন রাষ্ট্র এমন কি শরয়ী প্রশাসনও এমন একটি আমল করতে পারবে না। তা ছাড়া আপনারা সকলেই হয়ত জানেন যে, এ শিশুটি এক সময় ফেৎনার কারণ হবে কেবল এতটুকু আশঙ্কার উপর ভিত্তি করে এমন একটি কাজ করা সম্পূর্ণ হারাম এবং না জায়েয। অনেক শিশু এমনিভাবে ফেৎনার কারণ হচ্ছে যা আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তথাপি তার জীবন কেড়ে নেয়ার অনুমতি নেই এবং জীবন নেয়া তো দূরের কথা, অন্য কোন ধরনের কঠিন শাস্তিও নিষ্পাপ শৈশবে দেয়া যায় না। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, তাহলে কুরআনে কারীমের এ ঘটনাটিকে সূরা কাহাফের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে তাকে কেন অমর করে দিয়েছেন, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষেরা পড়তে পারে। তিনি একাজ এজন্য করেছেন যেন মানুষে বুঝতে পারে যে, ঈমানের কত মূল্য, যদিও এ আমলের অবকাশ বর্তমানে নেই, কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম এবং অবৈধ হত্যার শামিল। কিন্তু একে আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমের সূরা কাহাফের একজন পয়গম্বর এবং তাঁর সাথীর (যার ন্যূনতম দরজা হচ্ছে আল্লাহর ওলী) কর্ম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, এর মধ্যে কি রহস্য থাকতে পারে? রহস্য একমাত্র এটাই যে, আমরা যেন একথা চিন্তা করি যে, ঈমান এমন এক মূল্যবান বস্তু, যার জন্য হযরত খিজির আ. যিনি বিরাট সাধক, আরেফ বিল্লাহ এবং অত্যন্ত দূর দৃষ্টিসম্পন্ন আল্লাহর মাকবুল বান্দা ছিলেন। তিনি এমন একটি কাজ করলেন যে, বাচ্চাটার জীবনটাই ছিনিয়ে নিলেন। আর সে ঘটনাকে আল্লাহ পাক বর্ণনা করে শোনালেন এবং কুরআনে কারীমের মধ্যে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন যাতে পাঠকগণ বুঝতে পারেন ঈমান এত বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে, এর জন্য যত প্রকার আশঙ্কাই সৃষ্টি হোক না কেন, সেটা যতই প্রিয় বস্তু হোক না, তা দূরীভূত করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এভাবে চিন্তা করি না।

এটাই কুরআনে কারীমের মুজিযা এবং ইলহামী নুকতা, যা আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত ঘটনাটির মধ্যে যে, হযরত মূসা আ. এবং খিজির আ. একটি জনপদে প্রবেশ করলেন সেখানে তাঁরা দেখতে পেলেন একটি দেয়াল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এ সময়ে তাঁরা জনপদবাসীর নিকট এমন ভাব প্রকাশ করলেন যে, আমরা ভিনদেশী পর্যটক, আমাদের

মেহমানদারী হওয়া উচিত। এ বিষয়টি ভাষায়ও প্রকাশ করলেন, যেমন কুরআনে পাকে এর ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কিন্তু গোটা জনপদবাসীর কেউই কোন খবর নিল না এবং খানাপিনারও ব্যবস্থা করল না, শেষ পর্যন্ত তাঁরা ক্ষুধার্তই থেকে গেলেন কিন্তু সেখানকার যে দেয়ালটি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল সেটাকে হযরত খিজির আ. ঠিক করতে লেগে গেলেন, আর আপনারা তো জানেনই যে একটা পড়ন্ত দেয়াল ঠিক করা কত কঠিন কাজ, কোথায় পেয়েছিলেন মসলা এবং কতটা মেহনতই না তিনি করেছিলেন। হযরত মূসা আ. বলেছিলেন কি আশ্চর্য বৈপরিত্য? যারা আমাদের একটু খোঁজ পর্যন্ত করল না, আমাদের খাওয়া দাওয়ার বিষয়টা একটু জিজ্ঞেসও করল না, তাদের কি অধিকার ছিল এবং কিইবা ছিল তাদের ইহসান যে, এমন একটি দেয়াল যা মেরামত করতে তাদের শ্রমিক লাগত, পয়সা খরচ হত এবং তাদের দেখাশোনা করতে হত, সেই দেয়ালটিকে আপনি ঠিক করে দিলেন, তখন প্রত্যুত্তরে তিনি (খিজির আ.) বললেন,

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ.

এ দেয়ালটি ছিল দুটি ইয়াতীম বাচ্চার, যাদের পিতা ছিল নেককার। দেয়ালটি যদি পড়ে যেত তাহলে তার নিচে প্রোথিত গুপ্ত ধন প্রকাশ পেয়ে যেত, মানুষের সামনে পড়ে যেত এবং মানুষে লুটপাট করে নিয়ে যেত, এতে তারা সংকটাপন্ন দারিদ্র্যের সম্মুখীন হত এবং নিঃস্ব হয়ে পড়ত।

একদিকে তিনি একজনের প্রাণ কেড়ে নিলেন ঈমানের প্রতি ক্ষতির আশঙ্কা করে, অন্যদিকে আরেকজনের দেয়াল মেরামত করে দিলেন ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে আর যে দেয়ালের মালিক তারা নিজেরাও নয়, বরং তাদের পিতা নেককার ছিল তাই। আল্লাহ পাকই ভাল জানেন তিনি কতকাল পূর্বে ইন্তেকাল করে গেছেন। কিন্তু হযরত খিজির আ. তাঁর ঈমানকে এতটা মূল্যায়ন করলেন যে, তার খাতিরে তার রেখে যাওয়া দেয়ালটিকে মেরামত করে সোজা এবং ঠিক করে দিলেন এবং তার প্রোথিত সম্পদকে হিফাজতের ব্যবস্থা করলেন।

এ ঘটনা দুটিকে আল্লাহ পাক একই সূরার মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন, যাতে আপনাদের ঈমান এবং কুফরের মাঝের পার্থক্যটা জানা হয়ে যায়। একদিকে ঈমানকে এতটা মূল্যায়ন করা হল যে,

যেই শিশুটি ঈমানের জন্য আশঙ্কা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে শেষ করে দিলেন, অন্যদিকে ঈমানকে এমনভাবে মূল্যায়ন করা হল যে, যাদের পিতা ছিল নেককার এখনও তাদের সময় আসেনি, তারা এখনও প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি, তারা দুজন ছিল ইয়াতীম, তাদের পিতা ছিল যেহেতু ঈমানদার এবং নেককার, তাই আল্লাহ পাক তার ঈমানের মূল্যায়নে দেয়াল ঠিক করার ব্যবস্থা করলেন এবং ইলহামের মাধ্যমে অবগত হয়ে তিনি দেয়ালকে ঠিক করে দিলেন।

ঈমানকে জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়া ঈমানের দাবী

আমি বলতে চাচ্ছি এর দ্বারা আপনারা ঈমানের মূল্য উপলব্ধি করুন। এখন এ নির্দেশ নেই যে, কোন ব্যক্তিকে আশঙ্কা মনে করলে তাকে খতম করে দিতে হবে। বরং উত্তম হল, কারো প্রতি যদি আশঙ্কা হয়, তাহলে তাকে ঐ পড়ন্ত দেয়ালের মত মেরামত করতে হবে। অনুরূপ নিজ সন্তানদেরকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পতিত প্রায় দেয়ালের মত ঠিক করতে হবে। তাকে মজবুত এবং শক্তিশালী করতে হবে।

জানার বিষয় শুধু এতটুকু যে, যদি আমাদের মস্তিষ্কে এবং আমাদের আকীদার মধ্যে একথাটি শিকড় গেড়ে বসে যায় যে, ঈমান প্রাণ থেকেও অধিক প্রিয়। চিকিৎসাদি, পোশাক পরিচ্ছদের ধান্ধা এবং বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা প্রদান এ সমস্ত কার্যকলাপ থেকে অধিক প্রিয় মনে হবে দিলের মধ্যে ঈমানকে দৃঢ় করে দেয়া।

তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা, পোশাক পরিচ্ছদের এন্তেজাম এবং তাদের জন্য দুআ করা, তাদেরকে দেখে মনকে খোশ করা প্রভৃতি কার্যক্রম হতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের ঈমানকে হিফাজত করা এবং এমন ব্যবস্থা করা যেন ঈমান চলে যেতে না পারে। আমার শেষ কথাটি স্মরণ রাখবেন। ঈমান জীবন থেকেও অধিক প্রিয়।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষা কর।'

জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে কিভাবে? ঈমানের দ্বারাই কেবল রক্ষা করতে পারবে। সর্বপ্রথম এবং সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমানকে হিফাজতের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে এমন সব বিতর্ক, সে সব বিলাসিতা এবং সে সব পরিবেশ থেকে দূরে রাখা দরকার,

এমনকি ঐ সব বিদ্যালয় থেকেও দূরে রাখা দরকার যেখানে ঈমানের প্রতি ঝুঁকি থাকে এবং এর বিকল্প পন্থা তৈরী করতে হবে, যেন কেউ অশিক্ষিত না থাকতে পারে। অশিক্ষিত থাকার অনুমতি এ পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল না, বর্তমানও নেই। সুতরাং শিক্ষা আবশ্যক হওয়া দরকার। কিন্তু শিক্ষা এভাবে হওয়া উচিত নয়, যাতে ঈমানের জন্য ঝুঁকি আসে। এরপর গিয়ে মানুষ ইচ্ছামত আকাশে উড়ুক, সমুদ্রে সাঁতার কাটুক, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যত দূর ইচ্ছা উন্নতি করুক এবং বিরাট সম্পদশালী হয়ে যাক, অসুবিধা নেই।

তবে আল্লাহর নিকট এবং নবীগণের নিকট এগুলোর সামান্য কোন মর্যাদাও নেই, মূল্যায়নও নেই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঈমানের বাস্তব মূল্য উপলব্ধি করার এবং এটাকে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত উন্নতি এবং সমস্ত আনন্দের উপর প্রাধান্য দেয়ার তাওফীক দান করুন, যেন সর্বদা নিজ ঈমান নিয়ে ফিকির করতে পারে এবং নিজ সন্তানদের ঈমান নিয়ে ভাবতে পারে। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে ঈমানের ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

অনুবাদ : মাওলানা মুজাহিদুর রহমান শিবলী

নতুন তুফান ও তার প্রতিরোধ

মূল

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.

ভাষান্তর

মাওলানা অছিউর রহমান

পূর্ব কথা

আমি ردة جديـــدة (নতুন ইরতিদাদ) এবং دعوة جديدة (নতুন দাওয়াত) একটি ধারাবাহিক লেখা তৈরী করেছিলাম। লেখাটি দামেশকের জনপ্রিয় ইসলামী ম্যাগাজিন মাসিক 'আল-মুসলিমুন' এর দু'সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'আল-ফুরকান' সম্পাদক স্নেহাস্পদ মৌলভী আতীকুর রহমান সাহেব আরবী থেকে লেখাটির বড় সুন্দর অনুবাদ করেন এবং আল-ফুরকানের ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

যেহেতু লেখাটিতে বর্তমান সমাজের চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এবং এতে একটি বড় আশঙ্কাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যা অনুভূতিসম্পন্ন ও বিবেকবান অধিকাংশ মুসলমানই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাই তা দারুণভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি এ লেখাটি পুনর্বার কিছু সংস্কার ও সংশোধন করে পাঠকের খেদমতে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

এ লেখার বিষয়বস্তুতে প্রভাবিত হয়ে এবং এর নির্দেশনার সাথে একমত হয়ে লাখনৌর নিবেদিতপ্রাণ কিছু বন্ধু-বান্ধব মজলিসে তাহকীকাত ও নশরিয়াতে ইসলাম নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল আমার লেখাতে যে দাওয়াত ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সে মতে মর্মস্পর্শী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দাওয়াতী সাহিত্য-সাময়িকী, বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা। এ সংস্থা প্রতিষ্ঠার মূখ্য উদ্দেশ্য তাই যা আমি আমার লেখাতে পেশ করেছি। এ পুস্তিকার শেষে এ সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ইশতেহার সংযোজন করা হয়েছিল যাতে বিভিন্ন স্থানের চিন্তাশীল ও কর্মোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ এ ব্যাপারে চিন্তার সুযোগ পান এবং তাদের ঐক্যমত্য হলে এর সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন।

আধুনিক ইরতিদাদের বর্তমান গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল ডাক্তার রফিউদ্দীন সাহেবের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ 'কুরআন আওর ইলমে জাদীদ' (কুরআন ও আধুনিক জ্ঞান) -এর প্রাথমিক কিছু পৃষ্ঠা পড়ে। এতে চমৎকারভাবে সকল বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। আমি সেই মৌলিক ধারণাকেই আমার এ লেখাতে আরো বিস্তারিতভাবে সুস্পষ্ট করে আমাদের কর্মপদ্ধতি, দাওয়াত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসহ তুলে ধরেছি। এখন তা একটি চিন্ত াধারা ও একটি দাওয়াতী কর্মধারারূপে সকলের সামনে উপস্থিত।

আবুল হাসান আলী
৫ই জুন ১৯৫৯ খৃ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اَمَّا بَعْدُ-

নতুন ইরতিদাদ

ইরতিদাদ অর্থ ধর্মত্যাগ করা। ইসলাম ধর্ম যে ত্যাগ করে তাকে মুরতাদ বলে। ইসলামের ইতিহাসে ইরতিদাদের ঘটনা একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় এবং মারাত্মক ইরতিদাদের ঘটনা ছিল যা হযরত রাসূলে আকরাম সা. এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরই আরবের সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোতে দেখা দিয়েছিল। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. তাঁর ইস্পাতদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও নজীরবিহীন ঈমানের বদৌলতে তা অংকুরেই বিনাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় বৃহত্তম ইরতিদাদের ঘটনা ছিল খৃস্টধর্ম গ্রহণের ঘটনা। 'স্পেন' থেকে বহিষ্কৃত মুসলমানদের মাঝে তা মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। আশেপাশের পশ্চিমা খৃস্টান শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলোও এর প্রভাবমুক্ত ছিল না। খৃস্টান পাদ্রী ও মিশনারীগুলো তখন সেখানে এ উদ্দেশ্যে ব্যাপক মিশনারী তৎপরতা চালিয়ে ছিল।

উল্লেখযোগ্য এ ঘটনাদ্বয় ছাড়া ইরতিদাদের বিচ্ছিন্ন দু'একটা ঘটনাও আছে। যেমন, হিন্দুস্তানের বিচার-বুদ্ধিহীন কোন সংকীর্ণচেতা ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করল। কিন্তু তা এত বিরল যে, ধর্তব্যে আসে না। প্রকৃতপক্ষে যদি বদনসীব স্পেনীয়দের খৃস্টধর্ম গ্রহণকে ইরতিদাদ বলা হয় তবে তা বাদে মুসলমানদের ইতিহাস ব্যাপক কোন ইরতিদাদের ঘটনার সাথে পরিচিত নয়। ঐতিহাসিকগণ এ সত্য অক্লেশে স্বীকার করেছেন।

যখনই ইরতিদাদের কোন ঘটনা ঘটেছে তার দু'টি প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দেখা দিয়েছে। এক. মুসলমানদের পক্ষ থেকে মারাত্মক বিদ্বেষ ও অনীহা। দুই. ইসলামী সমাজের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। অর্থাৎ অতীতে যে কোন ব্যক্তিই ইসলাম ত্যাগ করেছে সে মুসলমানদের মারাত্মক রোষ ও বিদ্বেষের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে এবং আপনা-আপনি ইসলামী সমাজ থেকে সে বিচ্যুত হয়ে গেছে। শুধু ইসলাম ত্যাগ করার কারণে তার ও তার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝের সমস্ত বন্ধন, সমস্ত সম্পর্ক ঘুচে গেছে। মুরতাদ হওয়ার মতলবই হল, সে এক নতুন সমাজে, এক নতুন দুনিয়াতে প্রবেশ করল। মুরতাদের খান্দান

তাকে সম্পূর্ণ বয়কট করে দিত। উত্তরাধিকার, লেনদেন, বিয়ে-শাদী কিছুই তার সাথে চলত না। ইরতিদাদের কোন ঢেউ যদি কখনো উঠত, ধর্মীয় অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠত। মুসলমানদের মাঝে তার প্রতিবিধানের চেতনা এবং ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত হত। যেই ইসলামী রাষ্ট্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটত সেখানকার ওলামায়ে কেরাম, মুবাল্লিগীন এবং সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তার বিরোধিতায় একাত্ম হয়ে যেতেন। তার কারণ ও গূঢ় রহস্য খুঁজে বের করতেন এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতেন। মুসলিম সমাজের চেহারাই পাল্টে যেত, যেন এক মহাবিপর্যয় তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। নতুন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সাজগোজ রব পড়ে যেত। যুবক-বৃদ্ধ, নারী-শিশু নির্বিশেষে সকলের এক কাজ, এক ফিকির কিভাবে একে মোকাবেলা করা যায়।

ইরতিদাদের ঘটনা প্রতিবিধানে ইসলামী সমাজের এই অবস্থা ছিল আবশ্যক। অথচ এই ধরনের ঘটনা না কোথাও বেশি ঘটত, না জনজীবনে এর গভীর কোন প্রভাব ছিল। কিন্তু কিছুদিন হল, ইসলামী দুনিয়ার সামনে এমন এক ইরতিদাদের অভ্যুদয় ঘটেছে, যার বিষক্রিয়া ইসলামী বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়েছে। যা শক্তি ও দাপট, ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক থেকে এ যাবৎকালের সমস্ত ইরতিদাদী আন্দোলনকে ছাড়িয়ে গেছে। এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যা এর হামলা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে; বরং খুব কম খান্দানই আছে, যা তার হামলা থেকে নিরাপদে আছে। ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আবরণে ইসলামী এশিয়ায় স্মরণকালের সবচেয়ে মারাত্মক এই ইরতিদাদী ফেৎনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ইসলামের পরিভাষায় ইরতিদাদের অর্থ কি? এক ধর্মের স্থানে অন্য ধর্ম, এক বিশ্বাসের স্থানে অন্য বিশ্বাস গ্রহণ করা। রাসূল সা. যে শিক্ষা নিয়ে আগমন করেছিলেন, যা কিছু তাঁর থেকে অকাট্য সত্যরূপে বর্ণনা-পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং যা কিছু ইসলামে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত তাকে অস্বীকার করা। আর একজন মুরতাদ কি অবস্থান গ্রহণ করে? রিসালাতে মুহাম্মাদী সা. কে অস্বীকার করে ইহুদী, খৃস্টান বা হিন্দু ধর্ম গ্রহণের কিংবা নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করে এবং ঐশী প্রত্যাদেশ, রিসালাত ও নবুওয়াত এবং পুনরুত্থান ও আখেরাতের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে। ইরতিদাদের এই অর্থই পুরাতন যুগে এবং পুরাতন সমাজে প্রচলিত ছিল। যে ব্যক্তি নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করত, সে গীর্জায় যাওয়া-আসা করত, যে

অগ্নিপূজারী হত সে অগ্নিমণ্ডপে যেত, যে হিন্দু মাযহাব গ্রহণ করত সে দেব মন্দিরে যেত। স্পষ্টভাবেই তার ধর্মত্যাগের বিষয়টা বুঝা যেত। দূর থেকেই মানুষ তাকে মুরতাদ বলে চিনত। তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হত। মুসলমান তার থেকে সকল আশা-ভরসা পরিত্যাগ করত। তার ধর্মত্যাগের বিষয়টা কারো কাছেই গোপন থাকত না।

ইউরোপের পাচারকৃত দর্শন

কিন্তু ইউরোপ থেকে ইসলামী এশিয়ায় যে ইরতিদাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তা এক দর্শনের আকারে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী অস্বীকারই এ দর্শনের মূল বক্তব্য। যে মহাশক্তি এই বিশ্বজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, বিশ্বজগতের প্রতিটি নড়াচড়া, উত্থান-পতন, ঘটনা-দুর্ঘটনা যাঁর নিয়ন্ত্রণে, যে মহাশক্তি এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, একমাত্র যাঁর হুকুমে এই বিশ্বজগতে চলে সেই মহাশক্তিকে (আল্লাহ) অস্বীকারই এ দর্শনের মূল ভাষ্য। এই দর্শন ইলমে গায়েব, ওহী, নবুওয়াত, আসমানী বিধান এবং চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করে।

এ পর্যন্ত ইউরোপ থেকে আমাদের কাছে যত দর্শন পৌঁছেছে এর কিছুর সম্পর্ক জীববিজ্ঞানের সাথে, কিছুর সম্পর্ক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে, কিছুর সম্পর্ক আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষের সাথে আর কিছুর সম্পর্ক রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে। কিন্তু এটা এমন এক দর্শন, যার সম্পর্ক সবকিছুর সাথে, সবার সাথে। বিষয়ের দিক থেকে মানুষের পরস্পর যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এই দর্শন সবাইকে এক পয়েন্টে সমবেত হওয়ার আহবান জানায় যে, এই বিশ্বজগত ও বিশ্বজগতে বসবাসকারী মানবজাতিকে বস্তুবাদী ও প্রকৃতিবাদী দৃষ্টি নিয়ে দেখ এবং এ দুয়ের বাহ্যিক সমস্ত কাজ ও অবস্থাকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ নিয়ে পর্যালোচনা কর।

এই দর্শন মানুষের চিন্তাজগতে বিরাট প্রভাব ফেলে। আল্লাহর শক্তির উপর বিশ্বাসকে ক্রমান্বয়ে শিথিল করে দেয় এবং মানুষকে বস্তুর শক্তিতে বিশ্বাসী করে তোলে। এটা মানুষের মনোজগতে ও চিন্তাজগতে প্রভাব বিস্তারকারী একটি স্বতন্ত্র বিশ্বাস, একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। এটা তার মৌলিকত্ব, ব্যাপকতা, সার্বজনীনতা এবং মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক, তথা দিল ও দেমাগকে আচ্ছন্ন, বিকৃত ও বশীভূতকরণের ক্ষেত্রে ইসলামের পর জন্ম নেয়া সবচেয়ে বড় ধর্ম। ইসলামী রাষ্ট্রের যেই শ্রেণী শিক্ষা-দীক্ষায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে বিশেষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তারা এর চিত্তাকর্ষকরূপে মুগ্ধ হয়ে পড়ে এবং চোখ মুখ বন্ধ করে অকুণ্ঠ চিত্তে তা কণ্ঠনালী দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দেয় এবং পরম নিশ্চিন্তে হজম করে নেয়।

তারা এই ধর্মের এমন ভক্ত অনুসারী ও একনিষ্ঠ কর্মী বনে যায় যেমন একজন মুসলমান ইসলামের এবং একজন খৃস্টান খৃস্টধর্মের ভক্ত অনুসারী- প্রয়োজনে সে এর জন্য জীবন বিলীন করে, নিজস্ব শিল্প ও সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে এর দাওয়াত দেয়। যেই ধর্ম, যেই সমাজব্যবস্থা এবং যেই চিন্তা-চেতনা এর সাথে সংঘাতপূর্ণ হয় তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং এর অনুসারী সবাইকে ভাই ও বন্ধু বলে জানে। অনুরূপভাবে এই দর্শন গ্রহণকারী সবাই মিলে একটি উম্মাহ, একটি জাতি ও একটি দলে পরিণত হয়।

ধর্মহীনতা

এই নতুন ধর্ম- অবশ্য এর অনুসারী একে ধর্ম বলতে তৈরী নয়- এর সারবস্তু কী? বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দানকারী ঐ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় সত্তার অস্বীকৃতি, যিনি তাকদীরের অধিপতি এবং জীবন-ব্যবস্থার প্রকৃত নির্দেশক (اَلَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی), মৃত্যুর পর পুনঃ জীবন, হাশর, জান্নাত, দোযখ, সওয়াব ও আযাবের অস্বীকৃতি, নবুওয়াত ও রিসালাতের অস্বীকৃতি, আসমানী বিধি-বিধান ও ইসলামের দণ্ডবিধির অস্বীকৃতি এবং এ ই বাস্তবতার অস্বীকৃতি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত বান্দার উপর স্বীয় নির্বাচিত রাসূল সা. -এর আনুগত্য ফরয করেছেন এবং হেদায়াত ও সফলতা তাঁর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আখেরী ও স্থায়ী পয়গাম যা দীন ও দুনিয়ার তামাম সফলতা ও কল্যাণের একমাত্র প্রতিভূ। ইসলামই এমন এক জীবনব্যবস্থা যার কোন বিকল্প নেই এবং এ দীনই আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন। এই দীন ছাড়া দুনিয়াবী কামিয়াবী ও সফলতা সম্ভব নয়। সর্বোপরি এই কথাকে অস্বীকার করা যে, এই দুনিয়াকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর জন্য।

বর্তমানে যেই শ্রেণীর হাতে অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের এক বৃহৎ অংশ এই নতুন ধর্মের অনুসারী। অবশ্য তাদের সবার বিশ্বাস সমান নয়। কারো বিশ্বাস হালকা, আবার অনেকে এই বিশ্বাসে অত্যন্ত মযবুত। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে তাদের উপর বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও পাশ্চাত্য জীবন দর্শন প্রভাব বিস্তার করেছে, যা সম্পূর্ণ নাস্তিকতানির্ভর। এই দর্শন ও বিশ্বাস বহন করে আজো ইসলামী বিশ্বের হাজারো লাখো মুসলমান নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের সমস্ত উত্থান-পতন, ঘটনা-দুর্ঘটনা, বিপর্যয় ও স্বাচ্ছন্দ্য, মঙ্গলামঙ্গলকে প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়ম বলে বিশ্বাস করছে।

আলহামদুলিল্লাহ! নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয় যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং ইসলামের অনুসরণ করে। আমি আবার বলছি, এটাই ঐ ইরতিদাদ যা ইসলামী বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি খান্দান এর হামলায় আক্রান্ত হয়েছে। ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে শুরু করে সাহিত্য ও শিল্প কেন্দ্র, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সবকিছুর উপর এর আগ্রাসী থাবা বিস্তৃত হয়েছে। এমন খান্দান খুঁজে পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার, যার মাঝে এই ধর্মের কোন ভক্ত ও অনুরাগী নেই। আপনি যখনই তাদের কারো সাথে একান্তে আলাপ করবেন, তাদের মনের কথা বের করে আনবেন, আশ্চর্যের সাথে দেখবেন, হয়ত তার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নেই কিংবা পরকালের প্রতি বিশ্বাস নেই। সে রাসূল সা. -এর প্রতি বিশ্বাস রাখে না অথবা কুরআনকে একমাত্র জীবনব্যবস্থা মানে না। তাদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা কম নয় যারা অবহেলা ভরে বলবে, আমি এ ধরনের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করি না। আমার কাছে এর তেমন কোন গুরুত্ব নেই।

এক বেওয়ারিশ মাসআলা

নিঃসন্দেহে এই ইরতিদাদ ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, মুসলমানরা এর প্রতি কেন সজাগ নয়? কারণ এ ইরতিদাদের কোন প্রতীক নেই। এর অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন গীর্জায় যায় না, দেব মন্দিরে বা অগ্নিমণ্ডপে যায় না। সে নিজের ইরতিদাদ ও ধর্ম প্রত্যাখ্যানেরও ঘোষণা দেয় না এবং সমাজও তার এ ধর্ম প্রত্যাখ্যানে সচেতন নয়। তাই সামাজিকভাবে সে কোন রোষের মুখোমুখি হয় না। সে বরাবরের মত সমাজে বসবাস করে, সামাজিক অধিকার ভোগ করে, এমনকি সে সমাজ অধিপতি হওয়ারও সুযোগ লাভ করে। এটা ইসলামী বিশ্বের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাবনার বিষয়। ইরতিদাদের বিস্তৃতি ঘটছে, ইসলামী সমাজ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। অথচ মুসলমানদের এখনো নিদ্রাভঙ্গ হচ্ছে না। ওলামায়ে উম্মত এবং ইসলামের কেতনধারী কাফেলা এর জন্য অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা অনুভব করছে না। আগে যখন কোন জটিল মাসআলা আসত লোকেরা হযরত আলী রা. -এর কথা স্মরণ করত।

এরূপ ক্ষেত্রে প্রবাদ ছিল قَضِيَّةٌ وَّلَا اَبَا حَسَنٍ لَهَا যে কেউ এক জটিল মাসআলার সম্মুখীন অথচ এমন কেউ নেই যে হযরত আলী রা. -এর ধীশক্তি দিয়ে তার সমাধান দেয়। বর্তমান ইরতিদাদের নাযুকতম মুহূর্তে অলক্ষ্যেই হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. -এর দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ হয় এবং

বলতে হয় رِدَّةٌ وَّلَا اَبَا بَكْرٍ لَهَا ইরতিদাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু এমন কেউ নেই, যে হযরত আবু বকর রা. -এর ঈমানী কুওয়াত ও দৃঢ়তা নিয়ে তার টুটি চেপে ধরবে। কিন্তু মনে রাখবেন, লড়াই ও আন্দোলন এ মাসআলার সমাধান নয়।

এর জন্য গণমত তৈরীর চিন্তাও ঠিক নয়, জবরদস্তি ও চাপের মাধ্যমে এর সমাধান কোনদিন হবে না; বরং চাপ প্রয়োগে হিতে বিপরীত হবে। এ ফেতনা আরো চাঙ্গা হবে। ইসলাম ধর্মত্যাগী বিরুদ্ধবাদীদের অনুসন্ধান করে তাকে দমন করবে এমন কোন আদালতের স্বীকৃতি দেয় না। আর সে আদালত জুলুম ও জবরদস্তির পৃষ্ঠপোষক। এর সমাধানের জন্য প্রয়োজন কৌশল, দৃঢ়তা ও চরম সহিষ্ণুতা। কিভাবে এই ইরতিদাদের পথ রুদ্ধ করা যায় এবং ধর্মবর্জনকারী শ্রেণীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য প্রয়োজন গভীর চিন্তা-ভাবনা ও প্রচুর অধ্যয়ন।

ধর্মহীন বিশ্বপ্লাবী সয়লাবের আসল রহস্য

এ নতুন ধর্ম ইসলামী বিশ্বে কিভাবে বিস্তার লাভ করল? কিভাবে এত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হল যে, আজ মুসলমানদের ঘরে তা হানা দিচ্ছে? মানুষের দিল-দেমাগকে এত দ্রুততার সাথে, এত দাপটের সাথে আচ্ছন্ন করা কিভাবে এর জন্য সম্ভব হল? এ সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা, প্রচুর অধ্যয়ন ও গবেষণা।

আসল ঘটনা হল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে ইসলামী দুনিয়ার উপর ক্লান্তি, অবসাদ ও বার্ধক্যের লক্ষণ ফুটে ওঠে। দাওয়াত ও আকায়েদ, জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক থেকে ইসলামী দুনিয়া ক্রমশ অবক্ষয় ও অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। ইসলাম তো চির তরুণ। তা বার্ধক্য ও প্রাচীনতার সাথে আদৌ পরিচিত নয়। সূর্যের মত সর্বদাই দীপ্যমান। শত সহস্র বছরের পুরোনো হওয়া সত্ত্বেও সূর্য প্রতি মুহূর্তেই নতুন। আজো তার ভরা যৌবন। কিন্তু মুসলমানরা দুর্বলতা ও বার্ধক্যের শিকার হয়ে পড়ে। জ্ঞানের ব্যাপকতা, চিন্তা-গবেষণার শ্রেষ্ঠত্ব, বুদ্ধির গভীরতা, দাওয়াতের অনির্বাণ জযবা, সর্বোপরি ইসলামের আবেদনময় ভঙ্গিতে উপস্থাপনের যোগ্যতায় ক্রমেই তারা পিছিয়ে পড়ে। এছাড়াও অধুনা শিক্ষিত শ্রেণীর সাথে ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামের কির্তনধারী জামাআত সুসম্পর্ক রাখেনি, তাদের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়নি। অথচ তারাই ছিল আগত বংশধর। ভবিষ্যৎ তাদেরই।

এ নতুন বংশধরকে কেউ বলেনি যে, ইসলাম ফিতরতের ধর্ম, ইসলাম মানবতার শুষ্ক বাগিচায় জীবনসঞ্চারকারী বসন্তের পয়গাম। কুরআনই একমাত্র অবিকৃত, অলৌকিক ও চিরস্থায়ী গ্রন্থ, যার অলৌকিকত্ব অসীম, যার মাঝে চিন্তা-গবেষণার খোরাক অফুরন্ত, যার মাধুর্য ও নতুনত্বের কোন বিকল্প নেই। হযরত রাসূলে কারীম সা. ছিলেন মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি নিজেই ছিলেন এক জীবন্ত মুজেযা। তিনি সমস্ত যুগের, সমস্ত বংশধরের, সমস্ত ভাষাভাষির রাসূল ছিলেন। ইসলামী শরীয়ত মানবজীবনের জন্য গাইড বুক, একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। তার মাঝে যে কোন সমস্যার সঠিক সমাধানের এবং যুগের আবেদন বজায় রেখে চলার পূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান।

ঈমান-আকায়েদ, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং আধ্যাত্মিকতার বিশুদ্ধ সুষমাই হতে পারে একটি সভ্য সাজ ও একটি নির্মল সংস্কৃতির বুনিয়াদ। আজকের নব্য সংস্কৃতিমনা প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর কাছে টেকনোলজী ও যন্ত্রপাতি মজুদ আছে, কিন্তু আখলাক ও আকায়েদ, মননশীল জীবনবোধ এবং মানবতার কল্যাণের চিরন্তন উৎসধারা শুধুমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষার মাঝেই নিহিত। একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুসভ্য সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব যখন জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঠিক সংযোগ ঘটবে। ইউরোপ যখন তার দর্শনের বাহিনী নিয়ে ইসলামী দুনিয়ার উপর হামলা করে, তখন ইসলামী দুনিয়ার এই ছিল অবস্থা। এই দর্শনের আবিষ্কার, সংকলন এবং এর তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ হয়েছিল এমন এক যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও পণ্ডিতবর্গের থেকে, যাদের গবেষণাকে মানুষ মানব গবেষণার মেরাজ মনে করত। তারা মনে করত, অধ্যয়ন, অনুসন্ধান এবং মানুষের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্ত শেষ।

চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার এটাই সংক্ষিপ্ত-সার। এরপর আর কিছু চিন্তা করা যায় না। অথচ এ দর্শনের মাঝে কিছু বিষয় এমন আছে যা অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তিশীল এবং এসব বিষয় সঠিক। আবার অনেক বিষয় এমনও আছে যেগুলো শুধু অনুমান ও ধারণানির্ভর। এর মাঝে সত্যও আছে, মিথ্যাও আছে। জ্ঞানও আছে, অজ্ঞানতাও আছে; সঠিক স্বত্বও আছে, আবার কবিদের কল্পনাও আছে। এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, কল্পনা শুধু ছন্দ ও কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটা জ্ঞান ও দর্শনের ময়দানেও হয়ে থাকে। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে ইউরোপীয়রা ছিল বিজয়ী জাতি। আমরা ছিলাম পরাজিত ও শোষিত শ্রেণী। এ দর্শন বিজয়ী জাতির উদ্ভাবিত ফসল। আর বিজয়ী জাতির জীবনধারা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা বিজিত জাতি প্রভাবিত হয় এটা এক ঐতিহাসিক সত্য। তাই তৎকালীন উপমহাদেশসহ এশিয়ার শিক্ষিত

ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এক বিরাট অংশ ইউরোপীয়দের এ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তা বরণ করার প্রতিযোগিতা শুরু করে। তাদের মধ্যে এমনও ছিল যারা বুঝে বরণ করেছিল। তবে তারা সংখ্যায় স্বল্প। বেশি সংখ্যক তারাই ছিল, যারা সম্পূর্ণ না বুঝে 'ঈমান বিল গায়েব' রেখেছিল। কিন্তু সবাই সমানভাবে আচ্ছন্ন ছিল। সময়ে অগ্রসরমানতায় ক্রমান্বয়ে এ দর্শনের উপর বিশ্বাস রাখাই জ্ঞান ও সভ্যতার মাপকাঠি হয়ে ওঠে এবং একে প্রগতিবাদী ও আধুনিকতার আলামত মনে করা হতে লাগল। এভাবেই এ ইরতিদাদ ও ধর্মহীনতা ইসলামী পরিবেশ ও ইসলামী সীমানায় নির্বিঘ্নে ছড়িয়ে পড়ে। না মাতাপিতা এই পরিবর্তনের ব্যাপারে সচেতন ছিল, না উস্তাদ ও মুরব্বীদের এর কোন খবর হয়েছে। কারো ঈমানী সম্ভ্রমবোধও এতে আহত হয়নি। কারণ এটা ছিল নিরব বিপ্লব। এ ইরতিদাদ ও নাস্তিকতা বরণকারী কোন লোক গীর্জায়ও যায়নি, 'কোন উপাসনা গৃহেও প্রবেশ করেনি, কোন মূর্তির সামনে নতজানুও হয়নি।' অথচ আগে এগুলোই ছিল কুফর, ইরতিদাদ ও নাস্তিকতার মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী আলামত।

নেফাক ও নাস্তিকতা

আগেকার যুগে মুরতাদরা ইসলামী সোসাইটিকে বিদায় জানিয়ে সে দীন গ্রহণ করত তাদের সোসাইটিতে তারা অন্তর্ভুক্ত হত এবং নিজ বিশ্বাসের পরিবর্তনকে গর্বের সাথে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করত। এরপর নতুন দীনের পথে যত বিপদ-মুসিবত আসত অম্লান বদনে বরদাশত করত। তারা পুরাতন সমাজে যেই সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করত, এ সোসাইটিতে এসেও তা সংরক্ষিত থাকুক তার জন্য প্রচেষ্টা চালাত না। কিন্তু আজ যে সকল লোক ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা এর জন্য তৈরী নয় যে, ইসলামী সোসাইটি থেকে তাদের সম্পর্ক ঘুচে যাবে। অথচ দুনিয়াতে ইসলামী সমাজই একমাত্র সমাজ যার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব আকীদা-বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। সুনির্ধারিত আকায়েদ ছাড়া ইসলামী সমাজের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু বর্তমানের নতুন মুরতাদরা চায় মুসলিম সমাজের নাম ভাঙ্গিয়ে ইসলামপ্রদত্ত সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু নিজ বিশ্বাসে অটল থাকবে। ইসলামের ইতিহাসে এ অবস্থা সম্পূর্ণ নতুন।

জাহেলী সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাপ্রীতি

এ দর্শন একদিকে যেমন আকায়েদ ও আখলাকের গুরুত্বকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, তেমনি ইসলামী দুনিয়ায় ঐ সব জাহেলী আবেগ ও মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। যেগুলোর সাথে ইসলাম খোলাখুলি লড়াই করেছিল এবং

যেগুলোর উৎখাতের জন্য পয়গাম্বর আ. সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করেছিলেন। উদাহরণ- জাহেলী জাতীয়তাপ্রীতি, যা বংশ, রাষ্ট্র, ভাষা অথবা ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। জাহেলী যুগে গোত্রপ্রীতি ছিল আরবদের মজ্জাগত। গোত্রের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করা তারা তাদের পবিত্র দায়িত্ব মনে করত। এর জন্য তারা প্রাণ বিসর্জন দিত, মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধকে এর উপর ভিত্তি করে নির্মমভাবে পদদলিত করত। গোত্রপ্রীতি তাদের জাতীয় জীবনে একটি স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও একটি স্বতন্ত্র ধর্মের মর্যাদা লাভ করেছিল।

তাদের চিন্তা-চেতনাকে এটা এতটা প্রভাবিত করত যে, যিন্দেগীর সমস্ত কর্মকাণ্ড এ চেতনালোকেই নিয়ন্ত্রিত হত। আর বাস্তব সত্য এই, সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা ও জাতীয়তাপ্রীতি তার ক্ষমতা, শক্তি ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কারণে একটি ধর্ম ও একটি মাযহাবের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। যখন কোন সমাজে এটা বিস্তার লাভ করে আম্বিয়ায়ে কিরামের সমস্ত প্রচেষ্টা ও মেহনত প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং যে দীন প্রেরিত হয়েছিল মানুষের যিন্দেগীর প্রতিটি নিঃশ্বাসের যৌক্তিক রাহনুমা হিসাবে, তা ইবাদত ও কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর সেই উম্মতে ওয়াহেদা যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ.

তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে অগণিত উম্মতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। (সূরা মুমিনূন-৫২)

ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এত কঠোর কেন?

হযরত রাসূলে কারীম সা. জাহেলী গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে কঠিনভাবে লড়াই করেছেন। এ ব্যাপারে আগত উম্মতকে পরিষ্কার শব্দে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং এর সমস্ত সম্ভাবনার দ্বারদেশে নির্দয়ের মত কুঠার চালিয়েছেন। আর এ ধরনের পদক্ষেপের প্রয়োজনও ছিল। কারণ সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার বর্তমানে বিশ্বজনীন কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং উম্মতে ওয়াহেদার ঐক্য ও সংহতি চিরদিন নিরাপদে থাকতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতার মন্দ দিকগুলো তুলে ধরা এবং তার প্রতিরোধ করা ইসলামী শরীয়তের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে এ বিষয়ের ক্ষতিকর দিক বয়ান করা হয়েছে বরং ইসলামের সাথে সাম্প্রদায়িকতার দূরত্ব একটি স্বীকৃত বিষয়। যে ব্যক্তি ইসলামের মেজায বরং সাধারণ দীনী মেজাযের সাথে পরিচিত হবে, সে অতি সহজেই বুঝতে পারবে এই মেজায সাম্প্রদায়িকতার সাথে কোনভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কেউ যদি উন্মুক্ত মনে ইতিহাস অধ্যয়ন করে তবে সে এই সত্যকে কখনোই পাশ কাটাতে পারবে না যে, জাতিগত বিভেদ ও মানবীয় গুণাবলীর ধ্বংস ও বিকৃতির পিছনে যে সকল বিষয় মৌলিকভাবে কাজ করে তন্মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার স্থান সবার শীর্ষে। সমস্ত দুনিয়াকে একসূত্রে গাঁথার মহান ব্রত নিয়ে যে মানবজাতির অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে, ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও দেশের ভিন্নতা সত্ত্বেও সকলকে এক বিশ্বাস ও এক পতাকাতলে সমবেত করার মহান লক্ষ্যে যাদের আবির্ভাব ঘটেছে, ঈমান বিরাব্বিল আলামীন ও এক দীনকে কেন্দ্র করে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য যাদের পদক্ষেপ, কষ্ট ও কাটাভরা এ বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার ফুল যারা বিছিয়ে দেবে, যারা মানবতার সমস্ত বাগিচাকে মহব্বত ও ভালবাসায় সিঞ্চিত করবে, সবাইকে এমন এককে পরিণত করবে যেমন চিনি ও পানি মিশে গিয়ে এককে পরিণত হয়, যেন এক মন এক দেহ, একজনের দুঃখে অন্যজন কাঁদবে, একজনের ব্যথায় অন্যজন ব্যথিত হবে, তাদের তো উচিত জাতিগত ও গোত্রীয় সকল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তারা খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এমনভাবে লড়াই অব্যাহত রাখবে, যাতে এ ধরনের মানসিকতা এক অতীত দুঃস্বপ্ন হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে জাতীয়তাপ্রীতি

কিন্তু ইউরোপে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়ের পর হযরত রাসূলে কারীম সা. -এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দুনিয়ায় চিন্তা-চেতনা সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়ায় এমনভাবে ছেয়ে গেছে যেন কোন জ্ঞানের কথা বা কোন সত্য তার সামনে উৎঘাটিত হয়েছে। এর থেকে ফিরে আসার কোন সুরত নেই। আজ ইসলামী দুনিয়ার অবস্থা এমন ভয়াবহ যে, এতে বসবাসকারী প্রতিটি জাতি সাম্প্রদায়িকভাবে যিন্দা করার ব্যাপারে এবং এর গুণকীর্তনে অসম্ভব রকম উৎসাহী, অথচ ইসলাম একে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল। এমনকি গোত্রীয় ও জাহেলী ঐসব আচার-আচরণকে জীবন্ত করার প্রেরণা আজ উজ্জীবিত হচ্ছে যা স্পষ্টত মুর্তিপূজার বহিঃপ্রকাশ। আজ অনেক রাষ্ট্রে ইসলাম আগমনের পূর্ব সময়কে তাদের জন্য ঐতিহ্য ও গৌরবের কাল মনে করা হচ্ছে অথচ ইসলাম তাকে জাহেলিয়াত, একমাত্র জাহেলিয়াত নামে স্মরণ করে। এটা এমন এক শব্দ যার চেয়ে ঘৃণা ও উদ্বেগ প্রকাশক কোন শব্দ ইসলামের অভিধানে নেই। যার থেকে নিস্তার পাওয়াকে কুরআন মুসলমানদের উপর শুধু মহা অনুগ্রহই মনে করে না বরং এর জন্য আল্লাহর শোকর আদায়ের জোর তাগিদ করেন-

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا.

অর্থ : তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। (সূরা আলে ইমরান ১০৩)

بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন ঈমানের পথে পরিচালিত করে- যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা হুজুরাত- ১৭)

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَاِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : তিনি তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার জন্য। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি করুণাময় ও পরম দয়ালু। (সূরা হাদীদ - ৯)

জাহেলী যুগের ব্যাপারে এক মুসলমানের অবস্থান

এরপর তো একজন মুমিনের এই অবস্থা হওয়া চাই যে, জাহেলিয়াতের আলোচনা যখনই ওঠে চাই তা অতীতের হোক কিংবা বর্তমানের হোক- যেন ঘৃণা ও অবজ্ঞার সাথে ওঠে এবং প্রতি মুহূর্তে মুখ থেকে ঘৃণা ও নিন্দামিশ্রিত আবেগ ঝরে পড়ে। আপনি কি কোন বন্দীকে দেখেছেন যে, সে মুক্তি পাওয়ার পর তার বন্দী জীবনের দুঃখ-ক্লেশকে স্মরণ করে তখন অথচ তার প্রতি কথায় বন্দী জীবনের প্রতি ভীতি ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে না? জটিল ও ধ্বংসকর অসুস্থতা থেকে সুস্থতা লাভকারী যখন তার অসুস্থতার দিনগুলোর কথা স্মরণ করে, তখন অন্তর কি ব্যথিত না হয়ে থাকে? তার চেহারার রং কি পরিবর্তন হয় না? গভীর রাতে ভীতিকর কোন দুঃস্বপ্ন দেখা ব্যক্তি প্রভাতে তা স্মরণ করার সময় তা অসত্য ও অবান্তর হওয়াতে সে কি আল্লাহর শোকর আদায় করে না? অতএব, যদি বন্দী তার বন্দী জীবনের দুঃখ-ক্লেশকে আনন্দের সাথে স্মরণ না করে, জটিল রোগমুক্ত ব্যক্তির জন্য তার অসুস্থতার অসহায় মুহূর্তগুলোর স্মরণ যদি সুখকর না হয় এবং ভীতিকর দুঃস্বপ্ন দেখা ব্যক্তি তা শুধু স্বপ্ন-এ জন্য যদি দিল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত শুকরিয়া আদায় করে

থাকে, তবে জাহেলিয়াত তো তার তুলনায় অনেক বেশি ঘৃণিত ও ভীতিকর- তা সমস্ত অজ্ঞতা-মুর্খতা ও ভ্রষ্টতার উৎসধারা, তাতে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য আশংকাজনক ও ক্ষতিকর অসংখ্য জিনিস নিহিত আছে- তার আলোচনা মানুষের জন্য মারাত্মক অপছন্দের বিষয় হওয়া চাই এবং বর্বর যিন্দেগীর অবসান হয়েছে, আল্লাহ তাআলা গোমরাহীর অন্ধকার থেকে নাজাত দিয়েছেন। তাইতো সহীহ হাদীসে এসেছে-

ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ اِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ يُقْذَفَ فِى النَّارِ.

অর্থ : যার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকবে সে ঈমানের মজা অনুভব করবে। এক. আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সা. তার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তু অপেক্ষা প্রিয় হয়। দুই. যে মানুষের সাথে মহব্বত রাখে শুধু আল্লাহর জন্য। তিন. তার জন্য কুফরী ও ভ্রষ্টতায় ফিরে যাওয়া এত কষ্টকর যেমন কষ্টকর আগুনে নিপতিত হওয়া। (বুখারী শরীফ)

আল্লাহ তাআলা জাহেলী যুগের আচার-আচরণ ও জাহেলী নেতৃবর্গের নিন্দা করে বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেন-

وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ. وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ.

অর্থ : আমি তাদেরকে (দোযখবাসীদের) নেতা বানিয়েছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। কেয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিশম্পাত এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত। (সূরা কাসাস ৪১-৪২)

وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ. يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ. وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ.

অর্থ : ফেরআউনের কার্যকলাপ ভাল ছিল না। সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদের নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান! এ দুনিয়ায় তাদের অভিশম্পাতগ্রস্থ করা হয়েছিল এবং অভিশম্পাত হবে কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার, যা তারা লাভ করবে! (সূরা হুদ ৯৯)

ইসলামী রাষ্ট্রে জাহেলী যুগপ্রীতি

কিন্তু বর্তমানে অনেক ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদের অবস্থা হল তারা পাশ্চাত্য জীবনধারা ও ইউরোপীয়দের চিন্তা-চেতনায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম পূর্ব যুগকে এবং সে যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানকে ইজ্জতের দৃষ্টিতে দেখে। এতে তার হৃদয়ে সে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ জন্ম নেয়। সে আশা করে সে সব আচার-অনুষ্ঠান আবার নবজীবন লাভ করুক। সে এর জন্য তখনকার কৃষ্টি ও সভ্যতার পৃষ্ঠপোষকদেরকে ইতিহাসের কিংবদন্তি ভূমিকায় পেশ করার চেষ্টা করে, যেন সেই যুগ এবং সেই কৃষ্টি ও সভ্যতা তাদের জন্য মহামূল্যবান নেয়ামত ছিল। ইসলাম তাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছে। (আল্লাহ এরকম মন্দ অনুভূতি থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন)। এটা কত নির্লজ্জ কৃতঘ্নতা! ইসলাম ও ইসলামের নবী সা. -এর কতটুকু অবমূল্যায়ন! এর অর্থ এছাড়া আর কি যে, হৃদয় থেকে কুফর ও মুর্তিপূজার মন্দ অনুভূতি মুছে গেছে, জাহেলী আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তার হৃদয়ে কোন ঘৃণা অবশিষ্ট নেই -এর একজন অনুভূতিশীল মুসলমানের জন্য এটা অকল্পনীয়। যদি তার ঈমান চলে গিয়ে থাকে, সে ইসলামের দৌলত থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে এবং আল্লাহর রহমতের পরিবর্তে আল্লাহর গজব এসে থাকে তবেই তা সম্ভব হতে পারে। কুরআন এ মর্মে আমাদেরকে হুঁশিয়ার করেছে-

وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ.

অর্থ : যারা নিজেদের প্রতি জুলুম (শিরক) করেছে তাদের প্রতি তোমরা ঝুঁকে পড়ো না। ঝুঁকলে তোমাদেরকে অগ্নি স্পর্শ করবে এবং সে অবস্থায় তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং তোমাদেরকে কোন সাহায্য করা হবে না। (সূরা হুদ -১১৩)

দীনী, নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন

ইসলামী বিশ্বের বর্তমান অধঃপতনের পিছনে জাতীয়তাপ্রীতি ধ্যান-ধারণা ছাড়াও দ্বিতীয় আরেকটি ফেৎনার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাহল- সমাজের শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় মহলের ভোগবাদী মানসিকতা এবং পার্থিব আরাম আয়েশের পিছনে হন্যে হয়ে ছোটা। অন্য কথায়, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা, পার্থিব জীবনের প্রতি মোহ

এবং ভোগবাদী চিন্তা-চেতনা। এর স্বাভাবিক পরিণতি হল, মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলী ও নৈতিকতার অবক্ষয়। ইসলাম কর্তৃক হারাম বিষয়কে হালকাভাবে গ্রহণ, অশ্লীলতার প্রসার, মদ্যপ সমাজের সৃষ্টি এবং ইসলামের ফরয ও আবশ্যকীয় বিষয় থেকে এমন বাধা-বন্ধনহীন স্বাধীনতা যেন এই শ্রেণীর কাজের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কই নেই কিংবা ইসলামী শরীয়ত অতীত কোন দাস্তান ও বিয়োগান্ত উপাখ্যান ছিল, আজ তা মানসুখ ও রহিত হয়ে গেছে। ইসলামী দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে আজ এ ভোগবাদী মানসিকতা লালনকারী এক বিশাল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি আমাদের জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় আশংকা

এটা হল আজকের মুসলিম বিশ্বের সংক্ষিপ্ত চিত্র। এই চিত্রে যা কিছু ধরা পড়ে আমার কাছে তা জাহেলিয়াতের এমন এক আগ্রাসী প্লাবন মনে হয়, যা ইসলামের সমস্ত দৌলতকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মুসলিম বিশ্ব তার সমগ্র ইতিহাসে এমন সর্বগ্রাসী কোন প্লাবনের মুখোমুখি আর হয়নি। এর মত প্রচণ্ড প্লাবনেরও মুখোমুখি হয়নি, আবার এর মত বিশাল বিশ্বগ্রাসী প্লাবনেরও মুখোমুখি হয়নি। তাছাড়া এ প্লাবনের অন্য রকম বিশেষত্ব আছে। সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ সচেতন নয়। দু'একজন যাও বা আছে কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে সর্বশক্তি নিয়ে, সর্বস্ব দিয়ে এর প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আমরা অতীতের দিকে তাকালে দেখি, তৎকালীন সময়ে যখন গ্রীক দর্শন ইসলামী সমাজে ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতা বিস্তার করছিল তখনি তার প্রতিবিধানে এমন সব ব্যক্তিত্ব সর্বশক্তি নিয়ে তেজোদ্দীপ্ত হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, যাঁরা ইলমী গভীরতা, বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য, বিরল প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের তেজস্বীতায় ইসলামী ইতিহাসের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। এমনিভাবে যখন বহুজাতিক ভারতে ভাববাদী ও বহু ঈশ্বরবাদী চক্রের আবির্ভাব ঘটেছিল তখনও ওলামায়ে উম্মত ইলম ও প্রজ্ঞা, দলিল ও যুক্তির উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে রণসাজে ময়দানে সিনা টান করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাদের কুরবানীর বদৌলতেই ইসলাম ভেঙ্গে পড়া অবস্থা থেকে প্রকৃত রূপ-সুষমা ফিরে পেয়েছিল এবং পূর্বের তুলনায় আরো সুদৃঢ় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তাই তো পরে বিরোধিতার প্রচণ্ড ঢেউ ধেয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু মাথা নিচু করে ফিরে গেছে। সয়লাবের বেগবান স্রোত এসেছিল, কিন্তু অকার্যকর হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে।

প্রধান সমস্যা

যে সমস্যা মুসলিম বিশ্বের দিকে তুফান বেগে ছুটে আসছে, যার লক্ষ্য আমাদের দীনী ও আখলাকী বরবাদী, তা আজ আমাদের জন্য কুফর ও ঈমানের সমস্যা। আমাদের সামনে দু'টি পথ খোলা আছে। (এক) যুদ্ধের প্রস্তুতি, (দুই) আত্মসমর্পণ। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কোন পথ এখতিয়ার করব? ইসলামী দুনিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে যার একদিকে ইউরোপীয় দর্শন, ধর্মহীনতা, অন্যদিকে ইসলাম- আল্লাহর আখেরী পয়গাম। একদিকে বস্তুবাদ, অন্যদিকে আসমানী শরীয়ত। আমি মনে করি, এটা ধর্ম ও ধর্মহীনতার চূড়ান্ত লড়াই। এরপর দুনিয়া এ দু'টোর কোন একটাকেই গ্রহণ করে নেবে।

পবিত্রতম জিহাদ

ধর্মহীনতার সয়লাব আজ মুসলিম বিশ্বের সীমান্তের বহু ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আমাদের কিল্লায় নয় বরং আমাদের কলিজায় তা আঘাত করছে। আমি মনে করি, ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদের এ সয়লাবকে প্রতিরোধ করাই এখনকার জিহাদ, সময়ের সবচেয়ে বড় দাবী, বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় দীনী জরুরত। এ সময়ের সংস্কার ও বৈপ্লবিক কাজ হল উম্মতের যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে ইসলামের বুনিয়াদি বিষয় মৌলিক আকায়েদ ও ইসলামের শাশ্বত আদর্শের এবং রিসালাতে মুহাম্মাদীর প্রতি সেই বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা ফিরিয়ে আনা, যার বন্ধন তারা স্বেচ্ছায় আলগা করে ফেলেছে। আজকের সবচেয়ে বড় ইবাদত হল, ইসলাম সম্পর্কে যেসব সংশয়-সন্দেহ ও ধুম্রজাল তাদের মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে আছে; মননশীল, সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তা দূর করা এবং জাহেলী কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্রটিসমূহ চিহ্নিত করে অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ পদ্ধতিতে তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা, যাতে তাদের চিন্তা-চেতনা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং দিল ও দেমাগে ইসলামপ্রীতি স্থান করে নেয় বরং আরেকজন পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছানোর জযবা পয়দা হয়।

পূর্ণ এক শতাব্দী হতে চলেছে ইউরোপ আমাদের যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণীর মস্তিষ্ক বিকৃত করে আসছে। সংশয়-সন্দেহ, ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, ভণ্ডামী ও প্রতারণার বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে তাদের হৃদয়ে, চিন্তা-চেতনায়। এতে ধর্মীয় সকল বিষয়ে তাদের ঈমান নড়বড়ে হয়ে পড়েছে বরং সেখানে স্থান করে নিয়েছে বস্তুতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা। পূর্ণ এক শতাব্দী ধরে আমরা এই গ্লানি ও পরাজয়ের শিকার, কিন্তু আমাদের তা প্রতিরোধ করার কোন ফিকির হয়নি, আমরা তার কোন পরোয়া করিনি।

আমাদের যে সময়ের দাবী অনুযায়ী পুরাতন জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে নতুন অনেক জ্ঞানের, বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের সংযোজন করা একান্ত কর্তব্য ছিল; আমরা তা বুঝিনি। আমরা ইউরোপের ঐ সমস্ত দর্শনকে বুঝার এবং বুঝে তার যথাযথ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে দক্ষ সার্জেনের মত তার পোস্টমর্টেম করার কোন প্রয়োজন অনুভব করিনি। আমাদের সমস্ত সময় ব্যয় হয়েছে মৌলিকত্ব নেই এমন অনেক বিষয়ে। ফলে শতাব্দীর এ দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। আমাদের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর ঈমান ও বিশ্বাস আজ নড়বড়ে, ঘুণে ধরা।

এমন এক প্রজন্ম আমাদের শাসন ক্ষমতায় আসছে যাদের না ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের উপর ঈমান আছে, না তাদের মধ্যে ইসলামপ্রীতি, ইসলামী চেতনাবোধ এবং সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসনকে প্রাধান্য দেয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, না তার মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে জাতিগতভাবে সেও গণনায় মুসলমান -এ সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক আছে। আর যদি কিছু সম্পর্ক থাকেও তা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য। ব্যাস! এছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। এখনকার অবস্থা তো এর চেয়েও নাজুক। ধর্মবিবর্জিত মানসিকতা, অধর্মীয় চিন্তাধারা, বিজাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতিপ্রীতি আমাদের আওয়াম ও গ্রাম্য জনগণ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজ মুসলমানদের মাথার উপর ব্যাপক ধর্মহীনতার নাঙা কৃপাণ ঝুলছে। আল্লাহ না করুন, সময়ের অগ্রসরমানতায় সেই অবস্থা না উপস্থিত হয়, যখন ইসলাম জীবনের কর্মমুখর ময়দান থেকে বেদখল হয়ে শুধু শোভা ও বিলাসিতার জিনিসে পরিণত হবে।

ঈমানের দাওয়াত

এ মুহূর্তে ইসলামী দুনিয়ায় প্রয়োজন এক নতুন ইসলামী দাওয়াতের ও মেহনতের। এ দাওয়াত ও মেহনতের শ্লোগান হবে- এসো, আবার নতুন করে ইসলামের উপর ঈমান আনি, তবে শুধু শ্লোগান যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রথমেই ভাবতে হবে, বুঝতে হবে কোন রাস্তায় ইসলামী দুনিয়ার বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ও ক্ষমতাবান শ্রেণীর মন-মগজে পৌঁছা যাবে এবং তাদেরকে ইসলামে ফিরিয়ে আনা যাবে।

নিঃস্বার্থ ও নিবেদিত প্রাণ দাঈ'র জরুরত

আজ ইসলামী দুনিয়ার জন্য এমন কর্মোদ্যম জামাতের প্রয়োজন যারা এর জন্য হবে নিবেদিতপ্রাণ। জ্ঞান-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, যোগ্যতা, উপায়-উপকরণ সবকিছু এর জন্য উৎসর্গ করবে। ইজ্জত-সম্মান, পদ ও নেতৃত্বের

প্রতি তাদের কোন মোহ থাকবে না। তারা হবে হিংসা-বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা থেকে বহু উর্ধ্বে। অন্যের উপকারের চিন্তা করবে, নিজে উপকার গ্রহণ করবে না। শুধু দিবে, কিছু নেবে না। তাদের কর্মপন্থা হবে রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি থেকে ভিন্ন। তাদের দাওয়াত ও মেহনত হবে রাজনৈতিক আন্দোলনের (যার লক্ষ্য কেবল ক্ষমতা অর্জন) চেয়ে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ইখলাস হবে তাদের পুঁজি। প্রবৃত্তি পূজা, আত্মপছন্দ এবং সব ধরনের জাতীয়তাপ্রীতি থেকে তারা হবে সম্পূর্ণ পবিত্র।

দাওয়াতের জন্য নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন

সাথে সাথে আজ ইসলামী দুনিয়ার জন্য এমন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যা নতুন ইসলামী সভ্যতার জন্ম দেবে, যে সভ্যতা আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীকে ইউরোপীয় জীবনধারার নাগপাশ থেকে ছিনিয়ে পুনরায় ইসলামের দিকে, সার্বজনীন ইসলামী আদর্শের দিকে ফিরিয়ে আনবে। তাদের কেউ তো বুঝে শুনে আসবে, কিন্তু অনেকেই সময়ের আবহাওয়ায় প্রভাবিত হয়ে আসবে। যে সভ্যতা যুবকদের চেতনায় নতুনভাবে ইসলামের বুনিয়াদকে প্রতিষ্ঠিত করবে, তাদের হৃদয় ও আত্মার খোরাক হবে। এ কাজের জন্য ইসলামী দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে এমন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যারা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এ লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছু হটবে না।

আমি আমার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমি কস্মিনকালেও এ সকল লোকে দলভুক্ত নই যারা দীন ও রাজনীতির মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে। আর না তাদের দলভুক্ত, যারা পূর্বেকার সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে হটে গিয়ে ইসলামের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, যার দ্বারা ইসলাম যে কোন সমাজব্যবস্থা এবং যে কোন অবস্থার সাথে (চাই তা ইসলাম থেকে যত দূরে সরে গিয়ে হোক না কেন) ফিট হয়ে যায় এবং সব ধরনের সোসাইটিতে খাপ খায়। আমার তাদের সাথেও কোন সম্পর্ক নেই, যারা রাজনীতিকে কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِى الْقُرْاٰنِ এর মতলব মনে করে। আমি ঐ সমস্ত লোকদের প্রথম সারিতে, যারা মুসলিম জাতির মাঝে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা উজ্জীবিত করার প্রত্যাশী এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় যোগ্য নেতৃত্ব দেখার অভিলাষী। আমি তাদের দলভুক্ত, যাদের বিশ্বাস ইসলামী সমাজ ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হতে পারে না, যে পর্যন্ত না ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় এবং ইসলামী আইনই রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বুনিয়াদ হয়। আমি এর একজন একনিষ্ঠ দাঈ এবং যিন্দেগীর আখেরী নিঃশ্বাস পর্যন্ত এর উপর অবিচল থাকব।

অতীত অভিজ্ঞতা

এখন পর্যন্ত আমাদের সমস্ত চেষ্টা, আমাদের সমস্ত যোগ্যতা, সমস্ত উপায়-উপকরণ এবং সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। আন্দোলন ও নির্বাচন প্রাক্কালে আমরা মনে করি, আমাদের মাঝে পূর্ণ ঈমান আছে এবং জাতীয় নেতৃবর্গ (যারা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত শ্রেণী থেকেই হয়ে থাকে) তারাও পূর্ণ মুসলমান। ইসলামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির চেতনায় তারা উদ্দীপ্ত, ইসলামের অনুশাসন দণ্ডবিধি বাস্তবায়নে উৎসাহী, অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত। সামগ্রিকভাবে আজ তাদের মাঝে ঈমানী দুর্বলতা ও আখলাকী ত্রুটিতে ছেয়ে আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কোন খোঁজ খবর করি না. জনসাধারণের মাঝেও কোন সচেতনতা নেই। পাশ্চাত্যমুখী জীবনধারার প্রভাবে তাদের বেশিরভাগই এমন যাদের থেকে সত্যিকার ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস হারিয়ে গেছে বরং তাদের অনেকে তো খোলাখুলি ইসলামের বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে এবং পাশ্চাত্য জীবনধারাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসে। তার প্রচার-প্রসারের চিন্তায় সর্বদাই বিভোর হয়ে থাকে।

এই হল সেই শ্রেণীর অধিকাংশের ধ্যান-ধারণা। এরপর কাজের ময়দানে কেউ দ্রুততার পক্ষপাতী, কেউ আবার 'ধীরে চল' নীতির প্রবক্তা। কেউ চায় শক্তি দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে এই ধর্মহীনতাকে সমাজে চাপিয়ে দিতে। আবার কেউ চিত্তাকর্ষক, দৃষ্টিনন্দন লেবেল লাগিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তাদের সবার উদ্দেশ্য এক, গন্তব্যস্থল অভিন্ন।

ধর্মপ্রিয় শ্রেণীর মাঝে দুই গ্রুপ

আমাদের ধর্মীয় শ্রেণী অবশ্য তাদেরকে 'ধর্মীয় শ্রেণী' যদি বলা বৈধ হয়-বৈধতার কথা আসে, কারণ খৃস্ট সমাজের মত ইসলামে কোন পোপ শ্রেণী নেই, চিন্তাগত অবস্থানের হিসেবে দু'গ্রুপে বিভক্ত। এক গ্রুপ ইউরোপীয় দর্শনের মুখরোচক শ্লোগানের ফাঁদে আবদ্ধ আমাদের আধুনিক শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদেরকে তাকফির করে। তাদের ছায়া মাড়াতেও পছন্দ করে না। কিন্তু কি কারণে এদের মধ্যে ধর্মহীনতা ও নাস্তিক্যবাদের প্রতি অনুরাগ জন্ম নিয়েছে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করে না।

এ শ্রেণীর কাছাকাছি যাওয়া, মেলামেশা করা, ইসলাম ও ওলামায়ে কেরাম সম্পর্কে তাদের ভীতি ও অশ্রদ্ধা দূর করা, তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ঈমান ও কল্যাণের সামান্যতম বুঝ যদি রেখে থাকেন তাকে

আরেকটু চাঙ্গা করা, ইসলামের প্রতি আবেদন সৃষ্টি হয় এমন পুস্তক প্রণয়ন করে তাদের মধ্যে দীনী চেতনা জাগরিত করা, তার ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করে তাকে ইসলামের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা, দরদ ও ব্যথা নিয়ে তাকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নসীহত করা ইত্যাদি পদক্ষেপ তাদের কাছে যৌক্তিক পদক্ষেপ মনে হয় না। আর দ্বিতীয় গ্রুপ সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ শ্রেণীকে সহযোগিতা দেয়, তাদের দীনকে বিশুদ্ধ করার কোন ফিকির করে না। এ গ্রুপের মধ্যে না কোন দাওয়াতী রুহ আছে, না দীনী কোন সম্ভ্রমবোধ আছে।

সংস্কার ও বিপ্লবের জন্য যেই জামাতের প্রয়োজন

আজ এমন কোন জামাত নেই যার এ অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হবে। যারা উপলব্ধি করবে, আজকের শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় শ্রেণী অসুস্থ, কিন্তু এরা আমাদের ভাই। এদের চিকিৎসার দরকার। তারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। হেকমত ও কোমল ব্যবহার দিয়ে তাদের হৃদয়ে স্থান করে নেবে এবং অত্যন্ত মমতা নিয়ে তাদের কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করবে। এই তৃতীয় শ্রেণীর অনুপস্থিতির কারণেই আজ পশ্চিমা জীবনধারামুখী প্রজন্মের দীন ও দীনী পরিবেশের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয় না। তাদের সারা জীবন দীনী পরিবেশের প্রতি এক ধরনের ভীতি ও দূরত্ব থাকে। দীনদার এক শ্রেণী তাদের এই ভীতিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। চতুর্থ আরেক শ্রেণী আছে, যারা দীনের নামে তাদের থেকে নেতৃত্ব ও শাসনক্ষমতা দখলের শ্লোগান তুলে, তাদের ফাঁসী ও গ্রেফতারীর ধুয়া তুলে তাদের এই ভীতি ও দূরত্বকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

এ দু' গ্রুপ হিংসা-বিদ্বেষের এক নতুন দুয়ার উন্মোচন করা ছাড়া আর কিছু করে না। মানুষের স্বভাব হল মানুষ যদি দুনিয়ার লোভী হয় তবে এ ব্যাপারে সে কোন তত্ত্বাবধায়ককে বরদাশত করে না। যদি ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তার মাকসাদ হয়, তবে এ ময়দানে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না। আর যদি সে প্রবৃত্তিপূজারী ও দুনিয়ার আরাম-আয়েশের প্রত্যাশী হয় তবে এটা অসম্ভব যে, সে দুনিয়ার ভোগবিলাসে অন্য কাউকে তার অংশীদার বানাবে এবং ভোগ অধিকার দেবে। আজ ইসলামী দুনিয়ার বেদনার একমাত্র অবসানকারী হল ঐ জামাত, যারা হবে প্রবৃত্তিপূজার উর্ধ্বে নিঃস্বার্থ ধর্মপ্রচারক। তাদের উদ্দেশ্য হল সম্পদ হাসিল করা কিংবা নিজের বা পার্টির জন্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা- সন্দেহ উদ্রেককারী এমন সমস্ত পদক্ষেপ থেকে যারা হবে সম্পূর্ণ মুক্ত। যারা দীন বঞ্চিত শ্রেণীর মাঝে মেলামেশার

মাধ্যমে, পত্রাদি ও আলোচনার মাধ্যমে, দাওয়াতী সফরের মাধ্যমে, আবেদনশীল ইসলামী রীতিনীতির প্রচলন ঘটিয়ে, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব স্থাপন করে, মননশীল ও সুন্দর আখলাকের মাধ্যমে, অমুখাপেক্ষিতা, দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ মানসিকতা ও পয়গাম্বরসুলভ ব্যবহার দ্বারা তাদের সমস্ত সংশয়-সন্দেহ ও জটিলতা দূর করে দেবে, যা পশ্চিমা জীবনধারা ও দর্শনের প্রভাবে কিংবা দীনদার শ্রেণীর গাফলতির ফলে জন্ম নিয়েছিল কিংবা বুদ্ধিমত্তা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলাম ও ইসলামের নির্মল পরিবেশের সাথে দূরত্বই যার একমাত্র কারণ।

এ পদ্ধতিতে মেহনতকারীর সফলতা

এটাই ঐ জামাত, যাদের দ্বারা প্রত্যেক যুগে ইসলামের খেদমত হয়ে এসেছে। উমাইয়া শাসনের গতিধারা পাল্টে দেয়ার এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয র. কে খেলাফতের মসনদে বসানোর পিছনে কার্যকরী ভূমিকা এ জামাতেরই ছিল, যাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত রাজা ইবনে হায়াত র.। হিন্দুস্তানের মোঘল আমলেও এ ধরনের সংস্কার কাজ এ জামাতেরই পরিশ্রমের ফসল।

আকবরের মত দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে খোলাখুলি ইসলামের দুশমনীতে অবতীর্ণ হয়েছিল। যেন সে এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, যে ইসলামী সমাজ দীর্ঘ চারশত বছর হুকুমতের ছায়াতলে লালিত হয়েছে তাকে পুনরায় জাহেলিয়াতের নমুনায় সাজানো হবে।

ঠিক এমনি যুগ সন্ধিক্ষণে হক ও হক্কানিয়্যাতের প্রদীপ্ত মশাল নিয়ে সত্যের সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন মুজাদ্দিদে আলফেসানী র.। তাঁর ইখলাস, বুদ্ধিমত্তা এবং তাঁর ও তাঁর সাথীদের কুরবানীর বদৌলতে দীনে এলাহী প্রত্যাখ্যাত হয়, ইসলাম তার প্রকৃত রূপ সুষমা ফিরে পায় এবং পূর্বের তুলনায় মজবুত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই আকবরের পর মোঘল সিংহাসনে ক্রমাগত শাসকবৃন্দের প্রত্যেকেই পূর্বের শাসকের তুলনায় ভাল ছিলেন। এমনকি আওরঙ্গজেব আলমগীরের মত শাসকের জন্ম হয়। আওরঙ্গজেব আলমগীরের আলোচনা ইসলাম ও সংস্কার ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। আর একথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, ইতিহাসের সৃষ্টি সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবের পুনরাবৃত্তির জন্য, বারবার পুনরাবৃত্তির জন্য। মোটকথা, আজকের অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ায় ইসলামের পুনর্জীবন দানকারী শক্তি শুধু এই দাওয়াত, এই হেকমত এবং এই ইখলাস।

নাযুক অবস্থা

এ অবস্থাকে আমাদের হিম্মত ও দৃঢ়তা, হেকমত ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মোকাবেলা করতে হবে। ইসলামী দুনিয়ার উপর আজ এক মারাত্মক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইরতিদাদের মুসিবত এসেছে। ইসলামের জন্য যাদের হৃদয়ে সামান্যতম টানও আছে এই মুসিবত তাদের চিন্তা-গবেষণার ও আলোচনার একমাত্র বিষয় হওয়া চাই। আজ প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর এক বিরাট অংশের অবস্থা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। ঈমান ও আকীদার লাগাম থেকে তাদের হাত আলগা হয়ে গেছে। মানবীয় গুণাবলীর সমস্ত বন্ধন তারা ছুড়ে ফেলেছে। তাদের চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক হয়ে গেছে। রাজনীতিতে তারা ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। যদি 'অধিকাংশ' শব্দ আমি নাও বলি কিন্তু একথা অবশ্যই বলব, তাদের মধ্যে 'এমন' লোক অনেক আছে যাদের নিকট ইসলাম একটি আকীদা, একটি জীবনব্যবস্থা- এই ঈমানও নেই।

মুসলমান জনসাধারণ- যাদের মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের সমস্ত উপকরণ মওজুদ আছে এবং তারা স্বীয় বিশ্বাস ও স্বভাব হিসেবে মানবতার শ্রেষ্ঠ জামাত- এতদসত্ত্বেও এই শ্রেণীর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও চিন্তাধারার উৎকর্ষের কারণে তাদের অধীন ও অনুগত। যদি এই অবস্থা বরাবর চলতে থাকে তাহলে ধর্মহীনতা ও ফাসাদ তাদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করবে। গ্রাম্য সরলপ্রাণ মুসলমানরাও এর লুণ্ঠন থেকে নাজাত পাবে না এবং ক্ষেত-খামার ও কারখানার শ্রমিকদের ঈমানও এই ধ্বংসকর ভাইরাসে আক্রান্ত হবে। আজ ইউরোপে এগুলোই হচ্ছে। এভাবেই, এ গতিতেই হচ্ছে। যদি এ অবস্থার গতি ও রোখ পরিবর্তিত থাকে এবং মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর রহমত এর মাঝে প্রতিবন্ধক না হয় তবে উপমহাদেশের মাটিতেও এসব কিছুই হতে চলেছে।

এক্ষুণি কাজের প্রয়োজন

এ দায়িত্ব আদায়ে একদিনও বিলম্ব করার সময় নেই। মুসলিম বিশ্ব ইরতিদাদের মারাত্মক বিভীষিকার মুখোমুখি। এমন বিভীষিকা সমাজের উপর স্তরে যার বিস্তার ঘটেছে। এ বিভীষিকা ঐসব আকায়েদ, নেযামে আখলাক এবং মহা নেয়ামতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যা হযরত রাসূলে কারীম সা. -এর মীরাস, ইসলামী দুনিয়ার একমাত্র পুঁজি যা প্রজন্ম পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এর জন্য ইসলামের জানবাজরা পাহাড়সম দুঃখ-মসীবত বরদাশত করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, নিপীড়িত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন। যদি এই পুঁজি নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলিম বিশ্বও হারিয়ে যাবে।

আমরা কি এই সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করব? সময়ের এই নাযুকতা কি আমাদের হৃদয়ে কোন আবেদন সৃষ্টি করবে?

ঘর পুড়েছে ঘরের আগুনে

মূল

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.

অনুবাদ

মুহাম্মাদ ইদ্রিস আলী

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

এখন আমি যা কিছু বলতে চাই তা প্রকাশ করার জন্য একটি কবিতা বলব। উক্ত কবিতা লাখনৌবাসীর রুচি ও পরিভাষা। নবাবী যুগে অনুষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ -এর এক কবিতার আসরে উক্ত কবিতা পড়া হয়। সেখানে বড় বড় অনেক উস্তাদ উপস্থিত ছিলেন। একজন কম বয়সের কবি যখন তার গযলের এই অংশ কবিতার মজলিসে পড়া শুরু করল তখন পুরো আসরে হৈ হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল। কবিতাটি হচ্ছে-

সীনার দাগ থেকে অন্তরের ফোসকা জ্বলে উঠেছে
ঘরে আগুন লেগেছে ঘরের বাতি থেকে

উক্ত কবিতার দ্বিতীয় পংক্তি অধিক প্রসিদ্ধ। আর তা বিশেষ স্থানে পড়া হয়। যখন কোন ঘরের কোন বাচ্চা চালাক ও বুদ্ধিমান হয়, যার কপালে বীরত্বের চিহ্ন থাকে, তার ব্যাপারে তার বংশের কিছু প্রত্যাশা থাকে আর বিজ্ঞ লোকদের সাথে তার সম্পর্ক থাকে, যদি তার দ্বারা কোন ভুল হয়ে যায় এবং স্বীয় বংশে কালিমা লেপন করে অথবা স্বীয় বংশের কোন বিপদের কারণ হয় তখন লোকজন এ কথা বলে। আপনারা দেখুন, বর্তমান দুনিয়ার চিত্র এমনই। মানবতার ঘর পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ অর্থাৎ সারা পৃথিবী। ঐ ঘরের বাতিতেই ঘরে আগুন লেগেছে। বাইরে থেকে এই আগুন আসেনি।

মানবতার ইতিহাসে এটা কোন যুগেই হয়নি যে, জানোয়ার, পাখি, সাপ এবং বিচ্ছু মানবতার উপর কখনো সুসংগঠিত হয়ে আক্রমণ করেছে। ইতিহাসে এমন একটি উদাহরণও পাওয়া যাবে না যে, অমুক রাষ্ট্রের পতন এভাবে হয়েছে। রাষ্ট্রের ইটের সাথে ইটের এমনভাবে টক্কর লেগেছে যে, শহরের বাঘ, ভেড়া ও অন্যান্য জানোয়ার তার উপর আক্রমন করেছে এবং মানুষকে লোকমা বানিয়েছে এবং সভ্যতার চেরাগও নিভে গেছে। সাপ এবং বিচ্ছু তো শহরের ভিতরও আছে। কিন্তু একটি ঘর অথবা একটি বংশ সম্পর্কেও ইতিহাসে লেখা হয়নি যে, সাপ ও বিচ্ছুর কারণে উক্ত ঘর বা বংশ বিরান হয়ে গেছে। এলাকার পর এলাকা উজাড় হয়ে গেছে। মানবতার ইতিহাসে যত ট্রাজেডী আছে, দেশ ও জাতির ধ্বংস, সমাজ ও জীবন ব্যবস্থার বিলোপের যত ঘটনা আছে তার সবগুলোই মানুষের কৃতকর্ম। যদি আমাকে ক্ষমা করেন, তাহলে বলব, মানবতার ইতিহাসে বড় বড় ট্রাজেডী এবং মানুষের উপর যত বড় বড় মসীবত এসেছে তার বেশিরভাগই মানুষের

আনীত ছিল। যারা অধিক বিদ্বান, সভ্য ও সংস্কৃতিবান ছিল। যদি বলা হয় তারা অধিক মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিল তাহলেও ভুল বলা হবে না। কোন রাষ্ট্রকে কখনো মূর্খ, অশিক্ষিত লোকেরা ধ্বংস করতে পারে না। একটি ঘটনাও ইতিহাসে পাওয়া যাবে না যে, কোন রাষ্ট্র ঐ দেশের মূর্খদের হাতে ধ্বংস হয়েছে। ঐ সকল লোকদের এতটুকু জ্ঞান নেই। তারা তো ভারি ভারি কথা জানে। তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। তারা ধ্বংস করার অস্ত্র আবিষ্কার করতে পারে না। তাদের ব্রেন সে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। জাতি ও সমাজকে ধ্বংস করা কোন মামুলী ব্যাপার নয়। সে ধ্বংস কোন এক দুই ব্যক্তির ভুল অথবা কোন একটা স্তরের অত্যাচারের ফল নয়। যখন কোন সভ্যতার শিকড় উপড়ে যায়, সভ্যতা যখন বিলীন হয়ে যায় তখন তাতে ঘুণ ধরে যায়। ফলে জাতি ধ্বংস হয়ে যায়।

কোন জাতির গোলাম বা অধীন হওয়ার কারণসমূহ

ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে যে, কোন জাতি অপর কোন জাতিকে হাজার হাজার বছর পর্যন্ত শাসন করেছে। এটাতো অপ্রকৃতিগত ব্যাপার যে, কোন জাতি বাহির থেকে এসে অপর জাতিকে গোলাম বানাবে এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত গেলাম বানিয়ে রাখবে। কোন কোন জাতির পতনে অথবা কোন বাদশাহ অথবা শাসকের ভুলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, স্বয়ং হিন্দুস্তানের ইতিহাস দেখলে দেখা যায়, যখন এই ব্যবস্থাপনা গড়বড় হয়ে গেল, মানুষের ইজ্জত আবরু ভুলুণ্ঠিত হলো, জীবন তাদের জন্য শাস্তিযোগ্য হলো, না কোন নিরাপত্তা ছিল, না কোন শান্তি ও স্থিরতা ছিল। সে সময় রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষ বলছিল, কোন শক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করুক এবং আমাদের এই শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিক।

পয়গাম দু'ধরনের হতে পারে। প্রথমত অফিসিয়ালী হয়। আইন এবং লিখিত আকারে হয়ে থাকে। অপর পয়গাম হচ্ছে যা অন্তর, মস্তিষ্ক এবং আত্মার ভাষায় ব্যক্ত করতে হয়। আত্মা বলে থাকে এবং আত্মা শুনে থাকে। জাতির আত্মা যা অত্যাচারিত, মসীবত এবং কষ্টে ডুবে থাকে, ফরিয়াদ করতে থাকে। বাচ্চাদের আহাজারি, মহিলাদের বিলাপ, দুঃখে ভারাক্রান্ত মানুষের আহ, তাদের দিলের আহাজারি হাজারো পর্দা ভেদ করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যদিও সে রাস্তায় সমুদ্র প্রতিবন্ধক হয়, পাহাড় প্রতিবন্ধক হয়। এসব প্রতিবন্ধকতা আহাজারিকে ফিরাতে পারে না। যেমন- রাসূল সা. ইরশাদ করেন, মাজলুমের 'আহ' থেকে বাঁচ। এই জন্য যে, তার 'আহ' সোজা আসমানে পৌঁছে যায়। কোন জিনিস তাকে ফিরাতে পারে না।

আল্লাহ পাক তার সৃষ্টির প্রতি দয়া করেন। আমাদের এবং তোমাদের না থাকতে পারে, আল্লাহ পাক স্বীয় সৃষ্টিকে সর্বাবস্থায় ভালবাসেন। প্রত্যেক নির্মাতার তার সৃষ্ট জিনিসের সাথে মহব্বত হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের সৃষ্টজীব যেখানেই থাকুক যখন তার অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হবে, যখন মানবতা পদদলিত হবে, যখন তার অস্তিত্বকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে, যখন তার অধিকার হরণ করা হবে, যখন বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হবে, যখন দিনকে রাত এবং রাতকে দিন বলা হবে, যখন বাচ্চাদের মুখের খাবারের লোকমা ছিনিয়ে নেয়া হবে, যখন বিধবাদের মাথার উপর থেকে উড়না সরিয়ে ফেলা হবে, যখন গরীবের চুলা থেকে তাওয়া ছিনিয়ে নেয়া হবে তখন দেয়াল থেকে আওয়াজ আসা শুরু করবে, আমাদের সাহায্য কর, আমাদের সাহায্য কর ধ্বনির আহাজারি। সে সময় আল্লাহ এটা দেখবেন না যে, এ সকল গরীব দুঃখীদের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য কে কোথা থেকে এসেছে।

এটাই মানবতার ইতিহাসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা যে, যখন মানুষ জীবন্ত প্রোথিত হয়ে জীবন যাপন করে, যার এক ঘণ্টা এমনকি এক মুহূর্ত অতিবাহিত করাও কষ্টকর তখন সমস্ত দেশের পত্র-পল্লবে এবং দেয়াল থেকে এ চিৎকার আসতে থাকে যে, আমাদের বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও। আমরা আমাদের নেতৃবর্গ দিয়ে কী করব, যারা আমাদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ, তারা আমাদের কী কাজে আসবে? আল্লাহ পাক ঐ সকল নেতৃবর্গকে শাস্তি দেন এবং অসহায়দের সাহায্য করেন। আপনারা অনুসন্ধান করুন। যদি কখনো এমন অবস্থা তৈরী হয়, তখন বাহির থেকে কোন জাতি এসে ঐ দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, তারা উপকার করেও, উপকৃত হয়ও। এই অবস্থার উপর আপনারা যতই ভ্রু কুঞ্চন করুন তা আপনাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমি এতে মোটেই বিস্মিত নই। কেননা আল্লাহ পাক তার সৃষ্টিকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করে থাকেন। এবং উক্ত অবস্থা দীর্ঘদিন অবশিষ্ট থাকে না। আমার নিকট বহিরাগত কোন রাষ্ট্রের রাজত্ব চালানোর এটাই ব্যাখ্যা যে, দেশের নেতৃবর্গ এবং শাসক গোষ্ঠীর লাগামহীনতা ও অপকর্ম এবং মাজলুম মানুষের 'আহ' এর ফল।

বাইরের হুকুমত এবং নিজস্ব হুকুমতের পার্থক্য

কিন্তু এটা পরিষ্কার কথা যে, ইংরেজদের মস্তিষ্কে এই দেশে একশত বছর পর্যন্ত রাজত্ব করার সাথে এই দেশের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সময়টা তাদের নিকট শুধুমাত্র একটা দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় ছিল। তারা তো শুধু নিজেদের জাতির উপকারের জন্য এসেছিল এবং চলে গেল। যদি তারা এখান

থেকে রেললাইন উৎপাটন, ঘরবাড়ির দরজা-জানালা উপড়ে নিয়ে যেত তাহলে আমার নিকট আশ্চর্যের কিছু ছিল না। এই জন্য যে, তারা তো এই দেশেরই ছিল না। এই দেশে অবস্থান করে তারা নিজ দেশের চিন্তা করতো।

কিন্তু আশ্চর্য হলো এ বিষয়ে যে, ইংরেজরা এই ঘরের বাতি ছিল না। সত্য কথা হচ্ছে, তারা এই ঘরের আগুন ছিল। যদি তারা আগুন লাগাতো তাহলে আমরা আশ্চর্য হতাম না। তারা এখানে মেহমানের মত এসেছিল, মেহমানের মত ছিল এবং মেহমানের মত চলে গিয়েছে। তারা তো কয়েকদিন ছিল। ইংরেজদের চলে যাওয়ার পর এই দেশে আপনারা যে পথ অবলম্বন করেছেন সে পথ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। আপনারা আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনাদেরই একজন। যদি আমি আপনাদের দোষ বলি, তাহলে সেটা আমারই দোষ হলো। যদি আমি আপনাদের সমালোচনা করি তাহলে তা আমারই সমালোচনা হলো। এখানে আপনাদের আহবানের উদ্দেশ্যই হলো, আপনারা বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন আর আমরা তা স্বীকার করবো।

যারা এই দেশ থেকে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন দূর করেছিল। এরা ঐসব লোক যারা শুধু হিন্দুস্তানই নয় বরং মানবতার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছিলেন। এরা ঐ সবলোক যাদের সময়ে সকল প্রকার কষ্ট দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল। নিরাপত্তাহীনতা দূর হয়ে গিয়েছিল। বেইনসাফী বলতে কিছু ছিল না। আদালতসমূহ ন্যায়বিচারের প্রতিচ্ছবি হয়ে গিয়েছিল। বিচারালয় দায়িত্বশীলতা এবং আমানতদারীর নমুনা হয়েছিল। পুলিশের প্রয়োজন ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান ভাই ভাইয়ের মত মিলেমিশে থাকত। একতা, মহব্বত, প্রাধান্য ও কুরবানীর এই দৃশ্য আপনাদের মত অনেক লোকই দেখেছে। কারো ধারণায়ও এ কথা আসেনি যে, ইংরেজদের চলে যাওয়ার পর এই দেশের এই দৃশ্য হবে, যা আমরা দেখছি। এ দেশতো স্বয়ং নিজ দেশের লোকদের হাতে ধ্বংস হয়েছে।

আজ সমগ্র দেশ ও সমগ্র দুনিয়াতে মানবতা যেভাবে পদদলিত হচ্ছে সেটা তো এক লম্বা ইতিহাস এবং ব্যাপক বিষয়। আমি এ বিষয়ে কী আলোচনা করব? এর জন্য তো বহু স্টেজ হতে পারে। বিশাল বিশাল কিতাবও লেখা যেতে পারে।

আপনাদের কথাই আপনাদের বলব

কিন্তু আজ আমি আপনাদের কাছে আপনাদের কথাই বলব। আমি তো আমার ও আপনাদের সমালোচনা করব। নিজে বাদী হয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে আপনাদেরই আদালতে মামলা দায়ের করতে চাই। আজ আমাদের সামনে

রাষ্ট্রের যে চিত্র রয়েছে, তা কি স্বাধীনতা আন্দোলনের দিক নির্দেশকদের ধারণায়ও ছিল? আমার মনে হয়, তাদের মধ্যে কারো ভিতরেও যদি এ কথা এসে যেত তাহলে তাদের হাত-পা অবশ্য হয়ে যেত এবং যেই জযবার সাথে স্বাধীনতা আন্দোলন হচ্ছিল তা শেষ হয়ে যেত।

আমরা দেশের কী অবস্থা তৈরী করেছি! আমরা আমাদের হাত দিয়ে কিভাবে এই দেশের চিত্রকে পরিবর্তন করেছি। যেন এই দেশ কোন দুশমনের শিকারে পরিণত হয়েছে এবং সে ভালভাবে প্রতিশোধ নিতে চাইছে। আমাদের অন্তর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। মোটকথা, বুঝা যাচ্ছে যে, আমরা এই দেশকে উজাড় করে দিতে চাই। এই দেশের অস্তিত্ব রাখতে চাই না। এই দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক একজন শত্রুর ন্যায়। রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করে আপনি দেখুন। বাসে ভ্রমণ করে আপনি দেখুন। আপনি যে কোন স্থানে গিয়ে দেখুন। ইনাসফের সাথে বলুন কী হচ্ছে এসব? আমরা নিজেরাই নিজেদের দেশকে নিজেদের হাতে ধ্বংস করছি। রেলের অবস্থা এই যে, পাখা, পানির ট্যাপ, জানালা, সীটের কভার চুরি হয়ে যায়, গলির ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি হয়ে যায়। এই দিকে খেয়ালও করা হয় না যে, ছোট ছোট বাচ্চারা তাতে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে।

কেন এই অধঃপতন কেন এই অবক্ষয়

মানবতার এমন অধঃপতন এমন অবক্ষয়ের জন্য আমার নিকট কোন ভাষা নেই। এমন নীচু নীচু কথা এই সমাবেশে বলতে আমি কষ্ট অনুভব করছি। আমি বুঝতে পারছি যে, আমি আমার অবস্থান থেকে নিচে নেমে যাচ্ছি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যা ছাড়া অবস্থার সঠিক চিত্র আপনাদের সামনে আসবে না। এরপর দেখুন এক শহরের লোক অন্য শহরের লোককে কি ভাই মনে করে? এটা কি মনে করে যে, তারা আল্লাহ পাকেরই সৃষ্ট মানুষ? মোটেই না। প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এই দৃষ্টিতে দেখে যে, এ এক শিকার। আজ আমাদের সমাজে একজন দামী লোকের সাথে একটা কষ্টদায়ক জানোয়ারের মত আচরণ করা হয়।

আজ অবস্থা এই হয়েছে যে, আমরা আমাদেরই মত মানুষকে, আমাদের দেশের মানুষকে, এই শহরের মানুষকে ভাই মনে করি না। আমাদের দৃষ্টি তাদের পকেটে থাকে। আমাদের দৃষ্টি তাদের ব্যথিত হৃদয়ের প্রতি, তাদের জ্বলন্ত আত্মার প্রতি, তাদের অসহায় শিশুদের প্রতি তাদের বৃদ্ধা মায়েদের প্রতি, তাদের গরীব লোকদের প্রতি নেই। আমাদের দৃষ্টি তাদের পকেটের

চার পয়সার প্রতি নিবদ্ধ। সমগ্র দেশের অবস্থা এই হয়ে গেছে যে, কারো সাথে কারোরই কোন সমবেদনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। সমগ্র দেশ একটা বাজারী জুয়াখানায় পরিণত হয়ে গেছে। যাতে একজন জয়লাভ করছে আর হাজারো মানুষ পরাজিত হচ্ছে। কারো অন্তরেই কোন উচ্চ মনোবল, উন্নত চিন্তাচেতনা, মানবতার প্রতি সম্মান, আল্লাহ পাকের প্রতি একনিষ্ঠতা অবশিষ্ট নেই। এমনটা মনে হচ্ছে যে, আমাদের অন্তর ও মস্তিস্ক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে গেছে। আমাদের অন্তর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে। আমাদের অন্তর সংশোধন হওয়ার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছে। সবকিছুর মূল্যায়ন বিলোপ হয়ে গেছে। এখন শুধু একটা মূল্যায়নই অবশিষ্ট আছে আর তা হচ্ছে টাকা পয়সা মহব্বত। এই অবস্থা এবং এই অধঃপতন থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য কোন মানুষই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে রাজি নয়। সমগ্র দেশ ও সমাজ ইসলাহ ও সংশোধন হওয়া থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। এটা স্পর্শকাতর আলামত যে, যে কারণে দেশ ও জাতি উন্নতি করতে পারে না, সামাজিক অবক্ষয়ে সমগ্র দেশ উজাড় হয়ে গেছে, প্রত্যেক লোক স্বীয় উদ্দেশ্য ও সীমিত স্বার্থকে দেশের উপর প্রাধান্য দিচ্ছে।

মানবতাকে এ কারণে বিলাপ করা উচিত। মানবতার দাবীদারদের লজ্জায় মাথা ঝুঁকানো উচিত। মারাত্মক বিপর্যয়ে পাথর গলে যায় কিন্তু আমাদের সমাজের কঠিন হৃদয়ের মানুষগুলি এমন দৃষ্টান্ত পেশ করেছে যে, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই পাওয়া যাবে না।

সামাজিক অবক্ষয় থেকে ব্যক্তিগত প্রস্তুতি

সামাজিক অবক্ষয় থেকে ব্যক্তিগত প্রস্তুতির যে মেজায আমাদের দেশে শুরু হয়েছে তা এমন বিপদ সৃষ্টি করবে যা বাইরের শক্তিও সৃষ্টি করতে পারে না। রেল এবং উড়োজাহাজের বিপদ তো খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক অফিস, প্রত্যেক বাজার এবং জীবনের প্রত্যেক শাখায় এমন লুট, মানবতা ও সভ্যতার এমন অধঃপতন শুরু হয়েছে, যা মানুষের জন্য লজ্জা ও শরমের কারণ। সারা দেশে কাজে ফাঁকি দেওয়া, সুদখোরী এবং স্বজনপ্রীতির একটা মেজায তৈরী হয়ে গেছে। ঐ দেশই আছে যা ইংরেজদের সময়ে ছিল। কিন্তু জানি না, সংশোধনকারীদের কি হলো? দেশে না নিরাপত্তা আছে না ব্যবস্থাপনা আছে। কোন মানুষের এ আনন্দানুভূতি নেই যে, সে নিজের দেশে আছে। মানুষ বড় বড় সম্মান, বড় বড় সম্পদ ছেড়ে দিয়ে নিজের দেশে আসে এ জন্য যে, দেশের কথাই ভিন্ন হয়ে যায়। নিজের ঘর ও নিজের

দেশ বলার অর্থ এই যে, মানুষের সেখানে শান্তি, সম্মান ও খুশি অর্জিত হয়। একে অন্যের উপর আস্থাবান হয়। একজন অন্যজনের দুঃখে দুঃখিত হয়। এরই নাম নিজের ঘর নিজের দেশ। এমন দেশে কার বদ নজর লেগেছে, যেখানে না শান্তি আছে, না নিরাপত্তা আছে, ঘর এবং নিজের দেশের অর্থ এই যে, মানুষের সেখানে অধিক আরাম, আনন্দ, নিরাপত্তা ও শান্তি মিলে। যদি এটা না পায় তাহলে মানুষ এমন দেশের প্রতি মহব্বত করে কি করবে?

ইসলাহ থেকে নিরাশ হওয়া বিপজ্জনক

আমাদের কত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কত লেখক ও সাহিত্যিক রয়েছে। তারা কি মানুষের মধ্যে সঠিক নাগরিকত্বের অনুভূতি, মানবতার সম্মান ও সঠিক দেশপ্রেম সৃষ্টির নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা করেছে? আজ অবস্থাদৃষ্টে প্রত্যেক ব্যক্তি পেরেশান ও হতাশ। প্রত্যেক সভার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আজকের নাজুক পরিস্থিতি। প্রত্যেক লোক বলছে যে, না খানাপিনায় মজা আছে, আর না নিরাপত্তা আছে। কিন্তু আমরা এই অবস্থার দায়িত্বশীল। এই দুর্গন্ধযুক্ত পানিতে আমরা সবাই গলা পর্যন্ত ডুবে আছি। ঐ দুর্গন্ধযুক্ত পানি থেকে আমরা সকলেই আমাদের উপকারের জন্য মোতি বের করতে চাই। এই দুর্গন্ধযুক্ত পানির সমালোচনা তো সকলেই করে। কিন্তু তার চেষ্টা এই থাকে যে, সে তাতে ডুব দিয়ে সম্ভব হলে মোতি বের করে আনে।

এ সবই এইসব হতাশার ফল যে, এখন এই দেশের ভাগ্যে অবক্ষয়ই লেখা আছে। এটা সংশোধনের কোন উপায় নেই। এই হতাশা মারাত্মক বিপজ্জনক এবং দেশ ও জাতির জন্য ধ্বংসাত্মক।

ঢোলের ঘরে তোতার আওয়াজ

আমার বন্ধুগণ! দেশ বর্তমানে কঠিন বিপজ্জনক অবস্থায় নিমজ্জিত। বাহির থেকে আমাদের কোন বিপদ নয়। ঐ সময় শেষ হয়ে গেছে যখন এক দেশ অন্য দেশের উপর আগ্রাসন চালাত। এবং এক জাতি অন্য জাতিকে গোলাম বানাত। এর কোনটাই কল্পনা করা যায় না যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে একটা রাষ্ট্র অন্য একটা রাষ্ট্রকে অধীন করে ফেলে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই, প্রত্যেক ব্যক্তিই পেরেশান এবং তারা কোন রক্ষাকর্তার অপেক্ষা করছে। আমাদের দেশের লোকজন এই অবস্থায় এতটুই সংকুচিত হয়েছে যে, না তারা স্বাধীনতার উঁচু মূল্যবোধের প্রতি খেয়াল করছে, আর না গবেষণামূলক লিটারেচারের পরোয়া করছে যা স্বাধীনতার ব্যাপারে লেখা হয়ে থাকে। আর না তারা ঐ সময়ের বিপদ আপদের প্রতি খেয়াল রাখে যা ইংরেজদের সময়ে

এখানকার মানুষ বরদাশত করেছিল। তারা তো এই অবস্থার পরিবর্তনে আগ্রহী। যা এই দেশের স্বাধীনতা থেকে উপকৃত হওয়ার বড় বাধা।

স্বাধীনতার পর

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মানব ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি এই কিতাবে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। কিন্তু যে দেশের অধিবাসীরা সে দেশের প্রশাসন থেকে হতাশ তারা এটা বুঝে যে, এই দেশে হক আদায় হচ্ছে না। আমাদের বৈধ দাবী আমরা পাচ্ছি না। আমরা নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে পারছি না। এর থেকে বেশি প্রশাসনের প্রতি সাধারণ জনগণের অনাস্থা আর কি হতে পারে? কিন্তু এই কোটি কোটি নিরপরাধ জনগণ রাজনীতির ব্যাপারে একেবারে মূর্খ। জনগণ যারা এর মারপ্যাচ জানে না, এরা যা বলে খোলা মনে বলে। এটা তাদের অন্তরের আওয়াজ। এটা অবস্থার ভাষা, হাকীকত এবং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বারবার ঐ কথার ঘোষণা করছে যে, আমরা আস্থা ঐ নেযাম থেকে উঠে যাচ্ছে।

এক পার্টি সমস্যা নয়

আমি কোন এক পার্টি, এক দল বা কোন একটা গোষ্ঠীকে বলছি না বরং সমগ্র পার্টি, পর্যায়ক্রমে আগত সরকারসমূহ, নতুন অভিজ্ঞতার আহবানকারী, রাজনীতিবিদ এবং ক্ষমতার আশাবাদী সকলকে বলছি যে, এদের উপর থেকে সাধারণ জনগণের আস্থা উঠে গেছে। যদি আপনারা অন্তরকে ফাড়েন আর এই জন্য কোন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই। স্টেজে বয়ান করা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা ভিন্ন বিষয়, আসল বিষয় হচ্ছে যা ঘরে এবং গোপনে বৈঠকে প্রকাশ করা হয়। আকবর এলাহাবাদী বলেন- তোমরা মানচিত্র দেখ না, মানুষের অন্তর দেখ। কোন জিনিস অন্তরে আছে, কোন জিনিস মরে যাচ্ছে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ!

অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণ কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে অথবা কয়েকজন ব্যক্তিকে এবং কোন কোন সময় কোন একক ব্যক্তিকে সমগ্র সমাজ নষ্টের জন্য দায়ী করা হয়। আর মনে করে এই গোষ্ঠী অথবা এই ভ্রান্ত লোকটি সমগ্র জীবনকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। কিন্তু আমি এতে একমত নই। আমি ইতিহাস অধ্যয়নের ভিত্তিতে বলছি, একটা মাছ পুকুরকে দুর্গন্ধময় করতে পারে, কিন্তু একজন ব্যক্তি সমাজকে নষ্ট করতে পারে না। ঘটনা এই যে, ভাল সমাজে খারাপ মানুষ থাকতে পারে না, সে আছড়ে আছড়ে মরে যাবে। যেমনিভাবে মাছকে পানি থেকে বের করে দিলে আছড়ে আছড়ে মরে

যায়। এমনিভাবে যে সমাজ খারাবিকে উৎসাহিত করে না, খারাবিকে স্বাগত জানায় না, উক্ত সমাজে খারাবি কাপতে থাকে, তার দম বের হবার উপক্রম হয় এবং শেষ পর্যন্ত দম বের হয়ে যায়।

প্রত্যেক যুগেই ভালমন্দ লোক থাকে। কিন্তু সমস্ত খারাবিকে তাদের দায়িত্বে চাপিয়ে দেয়া এবং সমস্ত খারাবিকে তাদের উপর নিক্ষেপ করে দেয়া ঠিক নয়। যদি কতিপয় খারাপ লোক সমাজকে প্রভাবিত করেছিল, এর অর্থ এটা নয় যে, সমগ্র জীবনের চালিকাশক্তি তাদের হাতে ছিল যে, তারা যেভাবে চেয়েছিল জীবনকে সেভাবে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। বরং কথা এই যে, ঐ সময় সমাজে স্বয়ং খারাবি এসেছিল। ঐ সময় অন্তর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাতে খারাবির আধিক্য সৃষ্টি হয়েছিল। উক্ত সমাজে জুলুম, অত্যাচার এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। তারা স্বার্থপর এবং স্বার্থপূজারী হয়ে গিয়েছিল। যার অন্তরে ঘুণ ধরে যায়, যে মন পানি হয়ে যায় তাকে আপনারা কোন অবস্থাতেই অপরাধ থেকে ফিরাতে পারবেন না। আপনারা যদি তাকে শিকল দিয়ে বেঁধেও রাখেন তাহলেও অপরাধ থেকে সে বিরত থাকতে পারবে না।

কৃত্রিম অবস্থা

আজকের যে অবস্থা তা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম এবং অপ্রাকৃতিক। এই অবস্থা স্থায়ী থাকবে না। এটা দেশবাসীর দুর্বলতা যে, আমরা এই অবস্থাকে বরদাশত করছি। আমি বিদ্রোহের ঘোষণা দিচ্ছি না, আমি বিপ্লবেরও ঘোষণা দিচ্ছি না। আমি সংস্কারের ঘোষণা দিচ্ছি। আমি মানব অধিকারের আপীল করছি। হিন্দুস্তানের নাগরিক হিসেবে আপীল করছি। আমার যদি এই উঁচু ব্যক্তিত্ব এবং আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক না থাকত যারা সর্বপ্রথম এই দেশে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল এবং ঐ স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল, তাহলে আমি এতটা স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারতাম না। কিন্তু আমার দিল ও অন্তর এই তিক্ত ঘোষণা ও সমালোচনা সত্ত্বেও প্রশান্ত। কেননা আমার উপর আমার আসলাফ ও বুযুর্গদের রেকর্ড শুধু পাক ও পবিত্রই নয় বরং উজ্জ্বল এবং প্রৌজ্জ্বল।

খোদাভীতি এবং দেশপ্রেম

কোন দেশ অথবা জাতির সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বের জন্য এবং মানুষকে স্বার্থপরতা, অত্যাচার, বেঈমানী ও খেয়ানত থেকে বাঁচানোর জন্য মূলশক্তি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তার ভয়। যখন কোন মানুষের অন্তরে ও চিন্তায় এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকবে যে, এমন এক সত্তা আছেন যিনি অন্ধকারে আলোতে আমাকে দেখেন এবং আমাকে তার সামনে জবাবদিহি করতে হবে তাহলে সে কোন অন্যায় কাজ করতে পারবে না। সংশোধনের জন্য এর থেকে সুন্দর কোন ব্যবস্থাপনাপত্র নেই। এটা ঐ মূল শক্তি যা চোরকে রক্ষক বানায়। অতঃপর কোন অবস্থায় কোন শক্তি যদি বাঁচাতে পারে তাহলে তা হচ্ছে খাঁটি দেশপ্রেম।

এই অনুভূতি হবে যে, এটা আমাদের দেশ। এটা আমাদের শহর। আল্লাহ না করুন, কোন দেশে এই দুটি জযবাই যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে ধ্বংস হতে বাঁচাতে পারবে না। কোন দর্শন, উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, এক লক্ষ্য ইউনিভার্সিটি কাজে আসবে না।

ইউরোপ আজকে দেশপ্রেমের কারণেই টিকে আছে। তারা দু'টি বিশ্বযুদ্ধ করেছে। ইউরোপ দু'বার রক্তের সাগরে অবগাহন করেছে। আমাদের উপর তো শুধু রক্তের ছিটা পড়েছে। ইউরোপ তো রক্তের সাগরে নেমেছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ডুব দিয়ে বের হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধে কতক বড় বড় শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে লোকদের মধ্যে প্রকৃত দেশপ্রেম ছিল যা পুনরায় তাদেরকে দুনিয়ার মানচিত্রে স্থান করে দিয়েছে। ধ্বংসাবশেষের উপর একটা নতুন দেশ, একটা নতুন শহরের অস্তিত্ব হয়েছে। ইউরোপে হাজার হাজার অপরাধ, খোদাদ্রোহীতা, নাস্তিকতা, অবাধ্যতা এবং আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেম, ইনসাফপ্রীতি, দায়িত্বশীলতার অনুভূতি এক, প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ এবং জান ও মালের হেফাযতের অনুভূতি তাদের ধ্বংসকে থামিয়ে রেখেছে।

যদি কোন দেশ অথবা জাতির মধ্যে খোদাভীতি ও প্রকৃত দেশপ্রেম না থাকে তাহলে গঠনমূলক পরিকল্পনা এবং বস্তুবাদের উন্নতি তাদেরকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারবে না। দেশবাসীর এই অবস্থাকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে।

মুসলমানদের দ্বিগুণ দায়িত্ব

পরিশেষে আমি আমাদের মুসলমান বন্ধু ও ভাইদের বলব, বর্তমানে তাদের দ্বিগুণ দায়িত্ব। এক তো এই যে, তাদের ধর্মীয় কিতাব কুরআন শরীফ এবং তাদের নবীর শিক্ষা শুধু তাদেরকে ব্যাপক অবক্ষয়, জ্বলন্ত আগুন এবং সম্পদ পূজার ঐ প্রবাহিত দুর্গন্ধময় পানি থেকে বাঁচার শিক্ষা দেয় না। বরং তা থেকে তাদের বিরত রাখতে এবং তা থেকে জনগণকে বাঁচানোর

দায়িত্বও অর্পণ করে। তাদেরকে তাদের নবী সুস্পষ্ট পথ বলে দিয়েছেন যে, যদি কোন নৌকার কোন আরোহীকেও কোন প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা না করা হয় যে কারণে উক্ত নৌকা বিপদের সম্মুখীন হবে এবং এই নৌকা ডুবে তাহলে উক্ত নৌকার কোন আরোহীই বাঁচবে না। তখন কোন ভাল ও অভিজ্ঞতা কাজে আসবে না।

তাদের দ্বিতীয় দায়িত্বের কারণ এই যে, তারা এই দেশে মানবতার সম্মান, সাম্য ও মৈত্রী এবং সমাজী ইনসাফের পয়গাম নিয়ে এসেছিল। তারা এই দেশে নাজুক পরিস্থিতিতে সাহায্য করেছে। এই পয়গাম তাদের ধর্মীয় শিক্ষায় এখনো পুরোপুরি সংরক্ষিত আছে। যদি তারা দেশের সমাজের ঐ ডুবন্ত নৌকাকে উদ্ধারের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা না করত, তাহলে আল্লাহ পাকের সামনে অপরাধী ও গুনাহগার হিসেবে সাব্যস্ত হত। আর ইতিহাসে দায়িত্বহীন বরঞ্চ অকৃতজ্ঞ ও অপরাধী হিসেবে পরিগণিত হয়।

দীনী দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল

মূল
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

ভাষান্তর
জহির উদ্দিন বাবর

(মক্কা মুকাররমায় দাওয়াতে দীনের ওপর প্রদত্ত একটি ভাষণের অনুবাদ।)

আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর স্তুতি গাইছি এবং শোকরিয়া আদায় করছি ঐ সমস্ত লোকের, যারা আমাকে ইসলামী দাওয়াতের এই বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমার জন্য এটি সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমি এমন লোকদেরকে সম্বোধন করছি যারা উম্মতের বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং সবাই ইসলামের খেদমতে সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমার মনোযোগ বৃদ্ধির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, এই আলোচনা করছি এমন স্থানে (মক্কা মুকাররমা) যা ইসলামের প্রথম মারকায, রাসূল সা. প্রেরিত হওয়ার স্থান এবং দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র ভূমি। আমি যদি নিজেকে সম্বোধন করে আরবের এক কবির কবিতা আবৃত্তি করি তবে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কবি বলেন 'হাওমাতুল জান্দালের বুলবুলি তোমার জন্য গান গাওয়ার উপযুক্ত সময় এখনই। তুমি গান গাইতে থাক, কারণ তুমি এমন এক স্থানে অবস্থান করছ, যেখানে আমার প্রেয়সী তোমাকে দেখছে।'

প্রিয় সুধী! দাওয়াতে ইসলামের বিষয়বস্তু নতুন কিছু নয়। এ বিষয়ে অনেক কিছু লেখা ও বলা হয়েছে। বর্তমান সময়ে এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও বই-পুস্তক লেখা হচ্ছে। বরং এভাবে বলা উচিত যে, এ বিষয়ে স্বতন্ত্র লাইব্রেরী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এজন্য আমি চাই, আমার কথা-বার্তা শুধু দাওয়াতে দীনের পদ্ধতি ও কর্মকৌশল বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখব। তবে এর দ্বারা শুধু দাওয়াতের কর্মসূচীই নির্দেশ করবে না বরং মুসলিম বিশ্বের কর্মক্ষেত্র ও মুসলিম উম্মাহর করণীয় বিষয়েও আলোকপাত করবে। আমি আমার সীমাবদ্ধ পড়াশুনা, অতীত অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতার আলোকে শুধু এর কর্মপরিধির ওপরই কিঞ্চিৎ নজর দেয়ার প্রয়াস পাব। সামর্থ্যের জন্য আল্লাহর তাওফীক কামনা করছি।

এক.

মুসলিম জনসাধারণের সকল শ্রেণীর মধ্যে ঈমানের সজীবতা বৃদ্ধি ও এর প্রৌজ্জ্বল জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটাতে হবে। কেননা বৃহৎ এই জনগোষ্ঠীকে ইসলামের সঙ্গে জুড়ে রাখা এবং এর জন্য তাদের অন্তরে জোশ তোলা মজবুত দূর্গ সদৃশ। এর ওপরই ইসলামের ভিত্তি। ইসলামের অস্তিত্ব ও বিকাশের মূলধন এটিই। প্রত্যেক মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য তা ব্যবহৃত হয়। আত্মসচেতন ও জাগ্রত কিছু লোকের কর্মোদ্যমতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তরের

প্রশস্তি, সর্বোপরি ইখলাসের পরাকাষ্ঠা দ্বারা সমগ্র জাতি ঝলসে ওঠে। সাফল্য ও সমৃদ্ধির বিস্তৃত ভুবন খুলে যায় তাদের সামনে। ঈমানী শক্তির প্রাবল্য, দীনের প্রতি উজ্জীবন এবং কাজের উদ্দীপনার জন্য এর শর্তাবলী পূরণ করা অপরিহার্য। মৌল কর্মপ্রণালীতে এমন গুণ থাকতে হবে যা আল্লাহর সাহায্যকে অনিবার্য করবে। সমস্যা থেকে উত্তরণ এবং শত্রুদের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। তবে এর পূর্বশর্ত হচ্ছে আকীদার পরিশুদ্ধি, এক আল্লাহর প্রতি নিটোল বিশ্বাস, যাবতীয় শিরক ও ভ্রান্ত ধারণামুক্ত হওয়া। জাহেলী রসম, অনৈসলামিক রীতিনীতি, দ্বিমুখী আচরণ, কাজে ও কর্মে সমন্বয়হীনতা এবং অতীত জাতির বিচ্যুত আচরণ থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহর শাস্তি ও রুষ্টতাকে অবশ্যম্ভাবী করে। তাছাড়া বর্তমান যুগের বস্তুবাদী সভ্যতার অসংলগ্ন আচরণ থেকেও দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কারণ, প্রকৃতি পূজা মানুষকে শুধু স্রষ্টাবিস্মৃতই করে না বরং আত্মবিস্মৃতও করে ফেলে। যা দুনিয়াকে পতনের বেলাভূমিতে দাঁড় করিয়ে দেয়।

প্রত্যেকের দীনী অনুভূতিকে সঠিক পথে ব্যবহার করতে হবে। সুপ্ত অনুভূতিকে সর্বদা সতেজ রাখতে হবে, যাতে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সৃষ্ট সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান করা যায়। শত্রু-মিত্রের পার্থক্য সহজেই নিরুপন করতে পারে। চোখ ধাঁধানো উদ্ভাবন দেখে যেন ধোঁকায় না পড়ে যায়। ভবিষ্যতে যেন এমন কোন বিপর্যয় নেমে না আসে যা অনৈতিক জাতিপ্রীতি এবং জাহেলী বর্বরতার কারণে সংঘটিত হয়। ভাষাগত বাড়াবাড়ি, প্রাচীন রেওয়াজ-রসমের কঠোর অনুসরণ, সর্বোপরি অবৈধ নেতৃত্ব ও ঔপনিবেশিক চক্রান্ত মুসলিম জনসাধারণের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে। দীনী অনুভূতির অনুপস্থিতি এবং ঈমানী দুর্বলতাই মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।

দুই.

ধর্মীয় ভাবধারা ও দীনী অনুভূতিকে বিকৃতি এবং বর্তমান যুগের পশ্চিমা দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিভাষাসমূহকে দীনী উদ্দেশ্যে বর্ণনা থেকে বিরত থাকতে হবে। দীনকে নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ এবং বর্তমান যুগের বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে ইসলামী ভাবাদর্শের সমন্বয় সাধনের মত অতিমাত্রায় উদারতা প্রদর্শন থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। কেননা দীন ইসলাম চিরন্তন ও শাশ্বত, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কালোত্তীর্ণ। ইসলাম যে কোন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উর্ধ্বে। মানবমস্তিস্কপ্রসূত কোন মতাদর্শের মানদণ্ডে এই আসমানী জীবন

ব্যবস্থাকে তুলনা করা চলবে না। ইসলামকে বিশ্লেষণ করতে হলে ইসলামেরই দ্বারস্থ হতে হবে। আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের মূলনীতি এটাই ছিল। এর জন্যই তারা জিহাদ করেছেন। নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়েছেন। এই মানদণ্ডেই আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহকে এমন কাজ ও কথা থেকেও বিরত থাকতে হবে, যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ককে শিথিল করে দেয়, পরকালের বিশ্বাসের স্তম্ভকে দুর্বল করে ফেলে এবং মুমিনের অন্তর থেকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের জযবা, তাঁকে সন্তুষ্ট করার বাসনা ও তাঁর নৈকট্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্বহীন করে ফেলে। এর দ্বারা উম্মাহর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহর কাছে এমন লোকের কোন মূল্যায়ন ও গুরুত্ব থাকে না। এমনিভাবে পৌত্তলিকতার বিশ্বাস, নিরেট শিরক এবং জাহেলী ধ্যান-ধারণা থেকেও মস্তিস্ককে নিষ্কলুষ রাখতে হবে। বস্তুবাদী মতাদর্শের গতানুগতিক বিরুদ্ধাচরণ এবং ইসলামবিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদের মৌখিক বিরোধিতাকে যথেষ্ট মনে করা, দীনের শাশ্বত বিধানকে উপেক্ষা করে আধুনিক বস্তুবাদী মতাদর্শকে গ্রহণ করার নামান্তর।

তিন.

নবী করীম সা. -এর প্রতি আত্মা ও অন্তরের এরূপ গভীর সম্পর্ক রাখতে হবে, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যা নিজ সত্তা, পরিবার-পরিজন ও সমস্ত কিছু থেকে উর্ধ্বে। আখেরী রাসূল, শ্রেষ্ঠ মানব এবং হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসেবে মুহাম্মাদ সা. -এর ওপর ঈমান আনতে হবে। নবীর সঙ্গে সম্পর্কই দীনী সফলতার চাবিকাঠি–এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে হবে। সুতরাং এমন কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকতে হবে, যা তাঁর সঙ্গে স্থাপিত মহব্বতের ঝর্ণাধারাকে শুকিয়ে দেয় অথবা মহব্বতের সুদৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করে ফেলে। এর দ্বারা দীনের স্পৃহা ও উজ্জীবন নির্জীব হয়ে যায়। ফলে সুন্নতের ওপর আমলে ত্রুটি আসে, মনের মাঝে হতাশার সৃষ্টি হয়, মেজায বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে রাসূল সা. এর সীরাত ও সুন্নতের প্রতি অনাসক্তি এসে যায়। নবীপ্রেমের নূরানী বাতি প্রজ্জ্বলিত করার পরিবর্তে নির্বাপিত করার কারণ হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের এ দিকটির প্রতি প্রত্যেককে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। বিশেষত আরব ভাইদেরকে এ ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবতে হবে। কেননা আরবের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং নিকট অতীতের ঘটনাবলী তাদেরকে নববী আদর্শের এই ঝর্ণাধারা থেকে ছিটকে ফেলে

দেবার চেষ্টা করেছে। যা তাদের জীবনের অনন্য পাথেয়। যার সবচেয়ে বড় দাবীদার তারা, যা তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। কেননা নবী করীম সা. প্রেরিত হয়েছেন তাদের পূণ্যভূমিতে, কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হয়েছে তাদের যবানে, রাসূল সা. কথা-বার্তা বলেছেন তাদের মাতৃভাষায়।

চার.

শিক্ষিত শ্রেণী যাদের হাতে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মিডিয়ার কর্তৃত্ব, তাদের মধ্যে ইসলামের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামের ওপর স্থিতিশীলতার দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে এ কথার বিশ্বাস স্থাপন করা যে ইসলামের মধ্যে শুধু কালকে সঙ্গে নিয়ে চলা এবং উন্নতি-অগ্রগতির ময়দানে উৎকর্ষের যোগ্যতাই নয় বরং পূর্ণ মানব সভ্যতার নেতৃত্বদানেরও যোগ্যতা রয়েছে। জীবনতরীকে দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে গন্তব্যে পৌছে দেয়ার সামর্থ্যও রয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের অনিবার্য পরিণতি থেকে রক্ষা করে সঞ্জীবনী সুধা পান করানোর ক্ষমতা একমাত্র ইসলামেই বিদ্যমান। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এ কথার প্রমাণ পেশ করতে হবে যে, ইসলাম এমন কোন প্রেরণা শক্তি নয় যা কখনও নির্জীব হয়ে পড়বে অথবা এমন কোন মশাল নয়, যা কখনও নিভে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। দীন ইসলাম একটি চিরন্তন, কালোত্তীর্ণ ও সার্বজনীন মুক্তির পয়গাম। এটি নূহ আ. এর কিশতির মতো একমাত্র আশ্রয়স্থল যেখানে আরোহন করার দ্বারা সলিল সমাধি থেকে বেঁচে যেতে পারবে।

দীনী যোগ্যতার ব্যাপারে আস্থার সংকট অথবা তা একদম না থাকা মূলত আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর একটি ব্যাধি। কারণ, পশ্চিমা সংস্কৃতির ধাঁধায় পড়ে তাদের অনুভব-অনুভূতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। পশ্চিমাদের দেয়া টোপ গিলে তারা আজ বুঁদ হয়ে আছে। তাদের শেখানো বুলিই তারা আওড়িয়ে যাচ্ছে। এ শ্রেণীটিই সমস্ত উম্মাহর ধ্বংসের কারিগর এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতার জন্য দায়ী। দর্শন ও সাংস্কৃতিক যে সমস্ত অস্থিতিশীলতা সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করছে তা ঐ শ্রেণীর হেয়ালীপনা ও ভুল পরিচালনারই পরিণাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হচ্ছে, এ ধরনের লোকই মুসলিম উম্মাহর ওপর কর্তৃত্ব করছে। যারা শুধু ঈমান ও কুরআনের ভাষা বুঝত, যাদের মধ্যে ঈমানী জোশ জাগ্রত ছিল, যারা দীনের জন্য উৎসর্গ হওয়ার বাসনা পোষণ করত এ সমস্ত সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমান তথাকথিত ঐ আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে জিম্মি। পশ্চিমা ধাঁচে প্রণীত শিক্ষা কারিকুলাম শাসক শ্রেণী ও

জনসাধারণের মধ্যে অদৃশ্য এক দেয়াল সৃষ্টি করে দিয়েছে। যার কারণে সর্বত্র একটি অস্থিরতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অনুৎপাদনশীল এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকের শক্তিকে এমন অহেতুক কাজে লাগিয়ে দিয়েছে, যা উম্মাহর কোন উপকারে আসে না।

পাঁচ

মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। এর রগ-রেশায় বিচরণ করে তা ঢেলে সাজাতে হবে। মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে মিল রেখে নতুন করে এমন শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে যার দ্বারা তাদের হৃতগৌরব ও হারানো ঐতিহ্য ফুটে উঠে। মুসলমানদের জন্য প্রণীত শিক্ষাধারায় বস্তুবাদী দর্শনের কোন চিহ্ন থাকতে পারবে না।

শিক্ষার মৌল উপাদান নিছক জাগতিক উপকরণের ভিত্তিতেই নির্ণীত হবে না। কারণ, শিক্ষার সম্পর্ক মানুষের সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা মানুষের প্রকৃতিকে শালীন ও শৃঙ্খলিত করার যোগ্যতা রাখে। মানব সভ্যতার ইতিহাস বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অসম উপাখ্যানে ভরপুর। সুষ্ঠু ধারায় প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থাকে ভিত্তি করে মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকের উপযুক্ত পরিচর্যা করা গেলে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছা সম্ভব। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার শুধুমাত্র আংশিক পরিবর্তন ও সাধারণ কাঁট-ছাঁটই যথেষ্ট নয় বরং এ ব্যাপারে যত ধরনের প্রক্রিয়া ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন, তার সবটুকু গভীর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে খাটাতে হবে। সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করে মৌলিক চেতনা ঠিক রেখে সময় বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গ একটি শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে। কেননা এটি ব্যতিরেকে মুসলিম বিশ্ব নিজের পায়ে দাঁড়ানো কিংবা নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও উদ্দেশ্যের সফল প্রয়োগ ঘটাতে পারবে না। এটা ছাড়া মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য থেকে যেমন বঞ্চিত হবে, তেমনি নিষ্ঠা ও নিবিড়ভাবে কাজ করারও সুযোগ পাবে না। প্রচলিত ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত এমন কোন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যিনি ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান এবং মুসলিম সোসাইটিকে স্বকীয়তা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের জন্য ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা অনুযায়ী সরকারী অফিস, পাবলিক প্রতিষ্ঠান, বিচারালয় এবং প্রচার মাধ্যমগুলো পরিচালনা করছে। সুতরাং প্রচলিত শিক্ষাক্রম কোনক্রমেই মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুকূলে নয়।

ছয়.

প্রচলিত ধারার শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য প্রথম পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও স্কলারদেরকে ইসলামের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশাল অবদানসমূহ তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। ইসলামী শিক্ষাধারায় জীবনের নতুন প্রাণ সঞ্চালন করে সভ্য দুনিয়ার সামনে তা স্পষ্ট করে তুলতে হবে যে, ইসলামের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন প্রণালী সুউচ্চ ও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী জীবনবোধ মানব প্রকৃতির জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এতে কখনও বিকৃতির কোন সম্ভাবনা নেই। এর কার্যকারিতা ও সামর্থ্য কখনও কম-বেশি হয় না। মানুষের জীবন চলার প্রতিটি ধাপে ধাপে ইসলামের সফল দিকনির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম মানুষের জীবন প্রবাহকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য সার্বিক দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে। মানব রচিত রীতি-নীতি থেকে এই ঐশী বিধান অনেক গুণ বেশি উপযোগী ও উৎকৃষ্ট।

সাত.

মানব প্রকৃতি ও জাতিসত্তার মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির বীজ অনেক গভীরে প্রোথিত। বিশেষ করে এমন জীবনব্যবস্থা, যা দীনী গণ্ডিতে বিস্তৃত, যার গঠন প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় ভাবধারা বিশেষ গুরুত্ব পায়, যার দর্শনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারাণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে–এমন জীবনব্যবস্থা অথবা সংস্কৃতি থেকে কোন জাতিকে পৃথক করা তাদেরকে জীবনের বিস্তৃত ময়দান থেকে দূরে সরিয়ে সংকীর্ণ ধর্ম বিশ্বাসে আবদ্ধ করে দেয়ার নামান্তর। এর দ্বারা বর্তমানকে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। সুতরাং ইসলামী নেতৃত্ব ও মুসলিম সোসাইটির জন্য কর্তব্য হল দক্ষতার সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক কাঠামো তৈরি করা যা পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণ, অপরিণামদর্শিতা এবং অনুভূতির দেউলিয়াত্ব থেকে পবিত্র হবে। রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায় থেকে নিয়ে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান, সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি তথা জীবনের সকল পর্যায়ে বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর দ্বারা মুসলিম বিশ্বে শুধু ইসলামী জীবনধারার স্বপ্নিল নমুনাই উপস্থাপিত হবে না বরং ইসলামের নীরব এক তাবলীগও সাধিত হয়ে যাবে।

আট.

শিক্ষা ও চিন্তাধারাভিত্তিক পশ্চিমা সংস্কৃতি কারিগরী আবিস্কার ও জাগতিক উৎকর্ষের খাতিরে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে। এর দ্বারা মুসলিম বিশ্বের চিন্তা ও গবেষণার নতুন ক্ষেত্র আবিস্কৃত

হবে। ধর্মীয় ভাবধারা ও সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এমন একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হবে, যার ভিত্তি হবে ঈমান ও আখলাক, তাকওয়া ও ইনসাফ। এতে থাকবে সকল বিষয়ের ব্যাপ্তি। শক্তি ও সামর্থের দিক থেকে তা হবে অদ্বিতীয়। ফলে এর প্রভাব পড়বে জীবনের সকল পর্যায়ে। জনসাধারণের মধ্যে পরিতুষ্টি আসবে। মোটকথা, পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ঐ সমস্ত জিনিস নেয়া যাবে, যা মুসলিম জনসাধারণ, মুসলিম দেশ এবং মুসলিম শাসনের জন্য প্রয়োজন। কর্মের বিস্তৃত ময়দান আবিষ্কারের লক্ষ্যে পশ্চিমা ছাপমুক্ত যে কোন সংস্কৃতি প্রয়োজনমাফিক গ্রহণ করাতে দোষের কিছু নেই। ভিন্ন সংস্কৃতির যা অপ্রয়োজনীয়, তা থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দমূলক। কেননা মুসলিম বিশ্ব যদি পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রহণ করার মুখাপেক্ষি হয়, তেমনি পশ্চিমা বিশ্বের জন্যও মুসলিম দেশসমূহ থেকে অনেক কিছু নেয়ার আছে। বরং এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, মুসলিম দেশসমূহ থেকে শেখা ও কিছু অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা পশ্চিমাদের জন্য একটু বেশিই বটে।

নয়.

মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে এমন দেশও রয়েছে, যারা অতীতে ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যারা ইসলামের মৌল চেতনার বিলুপ্তি সাধন তথাকথিত 'প্রগতিশীল ইসলাম' বানানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত এবং ইসলামকে খণ্ডিত ও মনগড়াভাবে উপস্থাপন করছে তাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে, এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, যা কোন ইসলামী দেশে চলতে পারে না। ঐ শ্রেণীকে বুঝানো প্রয়োজন যে, অসম্ভব ও স্বভাববিরোধী নিরর্থক এই কাজে নিজেদের সামর্থ্য ব্যয় না করে দেশ ও জাতির নানামুখী শত্রুদের মোকাবিলায় ব্যয় করলে তা স্বজাতির কল্যাণ সাধন করবে। যে সব দেশের জনগণ অধিকাংশ মুসলমান, শাসনকর্তৃত্ব যাদের হাতে তারাও ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক চলে, সেখানে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দীনী অনুভূতিকে কাজে লাগাতে হবে, যা ইসলামী বিধান চালু করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করার ফলে আল্লাহর সাহায্য ও বরকতের যে অঙ্গীকার তা ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে। এসব দেশে অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় হাই কমান্ড নির্ধারণ

করতে হবে, যার ভিত্তি হবে ইসলামের পরামর্শভিত্তিক শাসনব্যবস্থা। পারস্পরিক মঙ্গল কামনা ও সহযোগিতার মানসিকতা বদ্ধমূল করতে হবে। অন্ততঃ নিজের মধ্যে এই সীমাবদ্ধতার উপলব্ধি থাকতে হবে যে, মুসলিম উম্মাহ আজ একক নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অথবা ইসলামী খেলাফত যা প্রতিষ্ঠিত করা মুসলমানদের ওপর ফরজ ছিল, তা করতে না পারার দায়বোধ সব সময় মুসলমানদের ভেতরে জাগরূক রাখতে হবে।

দশ.

অনৈসলামিক দেশসমূহে ইসলামের দাওয়াত এবং ইসলামের সঠিক পরিচয় অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও কৌশলের মাধ্যমে তুলে ধরার অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে এমন নীতির অনুসরণ করতে হবে, যাতে ইসলামের অমীয় সৌন্দর্যের শিক্ষা ফুটে উঠে এবং সময়ের রুচি-বৈচিত্র্যও যেন বজায় থাকে। যে সব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয়। জীবনকে ইসলামের আদলে এভাবে গঠন করতে হবে যেন তা অন্যকে আকৃষ্ট করে এবং অন্যদের অন্তর আসক্ত হয়। চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে ভালভাবে বুঝাতে হবে। দেশকে বিপর্যয় ও দুর্যোগ থেকে বাঁচানোর জিম্মাদারী গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম শুধু এই অবস্থায় নিজের প্রয়োজন ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে। এসব দেশেই মুসলমানরা নিজেদের দাওয়াতী খেদমত ও নেতৃত্বের ভূমিকা যথাযথ আদায় করতে পারে।

এগার.

শেষ পর্যায়ে এসে আমি আরজ করব, (এ বিষয়ে এটাই শেষ কথা নয়) ইসলামের প্রকৃতি, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, সুষ্ঠু বিবেকের চাহিদা এবং মানব প্রকৃতির সহজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি দাওয়াতী ও ঈমানী আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে অবশ্যই সর্বক্ষণ অব্যাহত থাকতে হবে। তবে তা হতে হবে ইতিবাচক উপায়ে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দায়ীদের মধ্যে পৌরুষদীপ্ত উঁচু হিম্মত, প্রসার দৃষ্টিভঙ্গির গুণ থাকতে হবে। যে সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অন্যায্য ও অন্যায়ভাবে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো সৎ সাহস থাকতে হবে। তবে আল্লাহর পথের দাঈরা এসব গুণাবলীর ধারক হওয়া অথবা তাদের মধ্যে এসব গুণাবলী সৃষ্টি তখনই সম্ভব যখন তারা পূর্ণ বিশ্বাস ও নিটোল আস্থার সঙ্গে কোন শক্তিশালী দাওয়াতী আন্দোলনে শরীক হবে। তাদের মধ্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস

থাকতে হবে। মনুষ্যত্ববোধ এই দীনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়—এটি ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে।

ইসলামের দাওয়াতী আন্দোলনের জন্য কুরবানীর জযবা, উন্নত ধ্যান-ধারণা, অসাধ্যকে সাধন করার হিম্মত, কষ্টসহিষ্ণু জীবন গঠন এবং প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নেয়ার মতো প্রস্তুতি থাকতে হবে। কেননা মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা ঐ ঈমানকেই সমীহ করে যাতে সৎ সাহস আছে, ঐ ব্যক্তিকেই সম্মান করে, যিনি নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে আস্থাশীল। যার মধ্যে কামনা-বাসনার প্রতি নির্মোহতা এবং ধন-সম্পদের প্রতি নির্লিপ্ততা থাকে, যিনি নিজের ওপর ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত—মানবপ্রকৃতি তার প্রতিই আসক্ত হয়। সুতরাং দুর্বল ব্যক্তি বলবান মানুষের সম্মান করার জন্য প্রকৃতিগতভাবেই বাধ্য। গরীব লোক ধনীদের সম্মান করে, নিরক্ষর শিক্ষিতকে সমীহ করে, এমনকি দুর্বৃত্তও ভদ্রলোককে অন্তরে অন্তরে মর্যাদা দেয়। ইসলামের ইতিহাস বীরত্বের কীর্তিগাথা এবং বজ্রকঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার বিরল ঘটনায় ভরপুর। জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মহল যারা বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, যাদের অন্তর জীবিত—তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নেতৃত্বের প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত, এদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করেছে।

সবল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সাংস্কৃতিক অনিষ্টতা থেকে মুক্ত, ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধের ধারক—এমন কোন ঈমানী ও দাওয়াতী আন্দোলনের অনুপস্থিতি ইসলামের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। সহীহ আকীদা এবং ইসলামী জীবনের জন্য বিরাট অন্তরায়। কেননা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অনিবার্য এমন কোন জিনিসে সমস্যা সৃষ্টি হলে সে আর বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে না।

সুতরাং দীনী ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যার ফল এই দাঁড়াবে যে, অন্য কোন আন্দোলন সামনে চলে আসবে যা গোমরাহীর দিকে ডাকবে। উদ্দেশ্য ও ফায়দাহীন বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর অসম্পূর্ণ ও নেতিবাচক আন্দোলন ধ্বংসের কারণ হয়। যারা ধর্ম, আন্দোলন এবং বিভিন্ন প্রকার দাওয়াতের বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন তারা জানেন যে, যখন কোন শক্তিশালী বিশুদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচী সামনে না থাকবে তখন ভুল কোন আন্দোলন এ স্থান দখল করে নিবে। যদিও কোথাও ভ্রান্তধারার সেই আন্দোলন কোন সমস্যার মোকাবিলা করে বসে, কুরবানীর কিছু জযবা প্রদর্শন করে, নিজের ভিতকে বুলন্দ হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস চালায়, মুসলিম দেশসমূহ ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে অনাগত ফাসাদ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা

করে, বড় কোন শক্তিকে ঘটনাচক্রে সামান্য দমিয়ে দেয়, সস্তা শ্লোগানের মাধ্যমে জনসাধারণকে নিজেদের বশে নিয়ে আসে, প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে নিজেদের বিন্দুসম কৃতিত্বকে সিন্ধু করে উপস্থাপন করে। তাদের এই আন্দোলনের মোহাচ্ছন্ন কর্মসূচী জনসাধারণের ওপর যাদুর ক্রিয়া করে থাকে। আগ-পিছ না ভেবে সবাই গড্ডলিকা প্রবাহের মতো এর সঙ্গে ভেসে চলে। বিশেষত শিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত নতুন প্রজন্ম এর ওপর দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড দেখে যারা ত্যক্ত-বিরক্ত তাদের মধ্যে এই আন্দোলনের যাদু এতই প্রভাব ফেলে যে, তা কোন বক্তার বক্তৃতা, লেখকের লিখনী এবং যুক্তিবাদীর যুক্তি ও দর্শন দূর করতে পারে না।

প্রথম হিজরী শতকে খারেজীদের ইতিহাস, ৬ষ্ঠ ও ৭ম হিজরী শতকে সূফিবাদ ও ফেদায়ী আন্দোলনের ইতিহাস, হাসান বিন সাব্বাহের দর্শন এবং ইসলামের নামে সামরিক ও সংস্কারবাদী আন্দোলনের ইতিহাস—বিকৃত পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনের দাবী নিয়ে যার উৎপত্তি, মিথ্যা ও প্রতারণার ঝাণ্ডা উড়িয়ে যা লোকদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল; এমনিভাবে সমকালীন সংস্কার ও সামরিক আন্দোলনসমূহ যা ভুল গন্তব্যের দিকে ধাবমান এবং নিছক রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হাজার হাজার তারুণ্যদীপ্ত যুবককে নিজেদের দলভুক্ত করে উৎসর্গিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করছে; এমনকি এরূপ অনেক দল ও মত যাদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক মনে করা হয় এবং যাদের চিন্তা-চেতনায় জাগরণ পরিলক্ষিত হয় তারাও এই উত্তাল প্রবাহে তৃণলতার ন্যায় ভেসে গেছে। কুরআনী নির্দেশনা ও ইসলামী আকাইদের আলোকে যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন তাদের অনুভূত হয়নি। ইসলামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোত্র ও দলসমূহকে ইনসাফের সঙ্গে পর্যালোচনা করার প্রয়াসও তারা চালায়নি।

মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কাছে একথা স্পষ্ট যে, একটি উত্তাল স্রোতধারাকে অন্য আরেকটি স্রোতধারাই রুখে দিতে পারে। একটি তুফানের মোকাবিলা করার জন্য এর থেকে শক্তিশালী আরেকটি তুফানের দরকার। মুসলিম বিশ্বে বর্তমান যে অবস্থা তাকে একটি নির্জীব বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। তারা আজ উচ্চবিলাস ও সুখনিদ্রায় বিভোর। তাদের মধ্যে শক্তিশালী কোন ঈমানী দাওয়াত কার্যকর নেই। সহীহ আকীদা এবং পূত-পবিত্র উদ্দেশ্যে কুরবানীর জযবা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক দিক থেকেও তারা আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এ বিষয়টি সব সময়ই একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

নানা ধরনের ভ্রান্ত মতবাদ ও আন্দোলনের জালে যুব শ্রেণীকে আটকে দেয়ার জন্য ভূমি উর্বর করা হচ্ছে। কেননা যুবকেরা বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়, তাদের সামনে বিশুদ্ধ কোন কর্মক্ষেত্র নেই। তাই তারা ঐ ভ্রান্ত আন্দোলনের ফাঁদে পা দিচ্ছে। কেননা সেখানে তারা এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করছে, যদিও তাদের আন্দোলনের অবস্থা হচ্ছে ঐ মরীচিকার মত, যার নকশা কুরআনে কারীমে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে 'যারা কাফের তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায় তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আন-নূর-৩৯)

যিনিই 'বর্তমান যুগে ইসলাম' এবং 'ইসলামের ভবিষ্যত' সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, যাদের কাছে আকীদার বিশুদ্ধি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের মর্যাদা ও দীনী শিক্ষা প্রিয় হয়, তাদেরকে এই বাস্তবতা সামনে রাখা উচিত। আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা কুরআনের একটি আয়াতের মাধ্যমে সমাপ্ত করব যাতে আল্লাহ তাআলা আনসার ও মুহাজিরদের প্রথম শ্রেণীর অল্প কিছু লোককে সম্বোধন করেছেন। যাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে সমস্ত দুনিয়া এবং মানবতার যোগসূত্র কায়েম করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন 'যদি তোমরা তা না কর তবে জমিনে বড় ধরনের ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে।' (সূরা আনফাল-৭৩)